ভবিষ্যৎ আমাদেরই

কন্যাশ্রী প্রকল্প

সব বাধা পেরিয়ে এগিয়ে চলা

ভবিষ্যৎ আমাদেরই

কন্যাশ্রী প্রকল্প

সব বাধা পেরিয়ে এগিয়ে চলা

বার্তা ঃ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কঠোরভাবে প্রতিটি মেয়ের লেখাপড়া করার অধিকার রক্ষা বিষয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। প্রতিটি মেয়ে বিনা বাধায় তাদের লেখাপড়া শেষ করতে পারলেই একমাত্র বাল্য বিবাহ নির্মূল করা সম্ভব।

বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ ও কিশোরীদের সামগ্রিক ক্ষমতায়নের জন্য 'কন্যাশ্রী প্রকল্প' পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মেয়েদের আর্থিক সাহায্য প্রদানের মাধ্যমে বাল্য বিবাহ রোধ করার জন্য এবং নারী শিক্ষা সুনিশ্চিত করার জন্য এই প্রকল্পের সূচনা করেন। এর পরিকল্পনা ও সার্থক রূপায়ণের কারণে এটি বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মাননায় ভূষিত।

২০১৭ সালের ২৩ শে জুন **কন্যাশ্রী** প্রকল্প 'দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগণের সেবা ও তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা'র জন্য রাষ্ট্রসংঘের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 'পাব্লিক সার্ভিস এ্যাওয়ার্ড ২০১৭' – এ সম্মানিত হয়েছে।

সেই গৌরবোজ্জ্বল দিনের পর তিনবছর কেটে গেছে। আজ আমি গর্ব করেই একথা বলতে পারি যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাল্য বিবাহ বিলুপ্তকরণে অগ্রণী এই প্রকল্প লিঙ্গ-বৈষম্য দূরীকরণ ও কিশোরীদের প্রতি সমাজের ধারণা ও আচরণের পরিবর্তনে আরো অনেক পথ অতিক্রম করেছে।

আজ কন্যাশ্রী মেয়েরা সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজের জায়গা করে নিতে পেরেছে। বহুদিনের কুপ্রথাগুলোকে চ্যালেঞ্জ জানাতে তারা সক্ষম হচ্ছে ।

এই বইটিতে এমন পনেরোটি মেয়ের গল্প আছে তারা নিজেদের জীবনে পরিবর্তন আনার সাথে সাথে তাদের পারিপার্শ্বিক ক্ষেত্রেও পরিবর্তনের সাড়া ফেলেছে। প্রতিটি ব্যক্তিগত সাফল্য রাজ্যের কিশোরী ও নারীদের সামগ্রিক জীবনেও যে পরিবর্তনের প্রভাব ফেলে এই দৃষ্টান্তগুলি তারই প্রমাণ।

Shashi Panja

ডঃ শশী পাঁজা

রাষ্ট্রমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্ব প্রাপ্ত),
নারী ও শিশু বিকাশ এবং সমাজ কল্যাণ দপ্তর,
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বার্তা ঃ

unicef
for every child

বাল্যবিবাহ আমাদের সমাজের পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোর অন্তরে এক সামাজিক প্রথা হিসেবে চলে আসছে এবং গত এক দশকেরও বেশি সময় UNICEF মেয়েদের অধিকার রক্ষার বিষয়ে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিশ্বস্ত সহযোগী হিসেবে বাল্যবিবাহ বিলুপ্ত করার পথে কন্যাশ্রী প্রকল্পের আট বছরের প্রচেষ্টায় তাই UNICEF পূর্ণ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

কন্যাশ্রী প্রকল্পের রূপায়নকারী দপ্তর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মহিলা ও শিশুবিকাশ ও সমাজ কল্যাণ। বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শর্তাধীন নগদ হস্তান্তর বা CCT প্রকল্পের মতোই এই প্রকল্পের প্রাথমিক রচনা হলেও এর মূল উপভোক্তা অর্থাৎ কিশোরী মেয়েদের ক্ষমতায়নের প্রয়োজনে নগদ সুবিধা প্রদানের অতিরিক্ত অনেক বিকাশমূলক কাজ আজ এই প্রকল্পের আওতায় এসেছে।

২০১৭ সালে 'কন্যাশ্রী প্রকল্প' সামাজিক সুরক্ষা প্রদান, কিশোরীদের ক্ষমতায়ন ও বাল্যবিবাহ বিলুপ্তির কারণে হেগে/ হেগ শহরে 'United Nations Public Service Award' নামক আন্তর্জাতিক পুরষ্কার লাভ করেছে।

সামাজিক পরিবর্তন একটি মন্দগতির অপ্রতীয়মান পদ্ধতি হিসেবে দেখা দেয় যা প্রথমে ধারনা ও বিশ্বাসের পরিবর্তন ঘটায় এবং অবশেষে অভ্যাস ও আচরণে পরিবর্তন আনে। গল্পগুলির মধ্য দিয়ে এই বইয়ে আমরা সমাজ পরিবর্তনের কতগুলি বাস্তব উদাহরণকে সামনে এনেছি।

এই প্রকাশনা কিশোরীদের ক্ষমতায়ন ও বাল্যবিবাহ বিলুপ্তির বিষয়ে UNICEF –এর প্রতিশ্রুতির একটি স্মারক।

মোহাম্মদ মহিউদ্দিন
কর্তা, ইউনিসেফ অফিস, পশ্চিমবঙ্গ

সূচীপত্র

মুখবন্ধ 10

ভূমিকা 13

কন্যাশ্রী – পরিবর্তনের গল্প 18

গল্প – 01
নাজেমা খাতুন
সুতি ২,
মুর্শিদাবাদ
18

গল্প – 02
শান্তানুর আহসানিয়া
রায়নগর,
মুর্শিদাবাদ
21

গল্প – 03
সাহানারা খাতুন
সুতি ২,
মুর্শিদাবাদ
23

গল্প – 04
রুমি খাতুন
খড়গ্রাম,
মুর্শিদাবাদ
26

গল্প – 05
রুবাইয়া পরভিন
কুচবিহার ১ ব্লক,
কুচবিহার
29

গল্প – 06
পঞ্চমী মল্লিক
কোচবিহার ২ ব্লক,
কোচবিহার
32

গল্প – 07
ঊষসী কন্যাশ্রী ক্লাব
কোচবিহার সিটি,
কোচবিহার
34

গল্প – 08
আয়েষা সুলতানা
বর্ধমান মিউনিসিপাল
এলাকা, পূর্ব বর্ধমান
37

গল্প – 09
রিবিনা টোপ্পো
মালবাজার মিউনিসিপাল
এলাকা, জলপাইগুড়ি
38

গল্প – 10
রেশমা পরভিন
নাগরাকাটা,
জলপাইগুড়ি
40

গল্প – 11
কন্যাশ্রী ক্লাব
জলপাইগুড়ি
43

গল্প – 12
অঞ্জলী দাস
রাজগঞ্জ ব্লক,
জলপাইগুড়ি
44

গল্প – 13
কন্যাশ্রী ক্লাব
বর্ধমান ১,
পূর্ব বর্ধমান
47

গল্প – 14
কন্যাশ্রী ক্লাব
ভাতার,
পূর্ব বর্ধমান
50

গল্প – 15
লীনা মুখার্জি
ভাতার,
পূর্ব বর্ধমান
53

মুখবন্ধ

নারীদের ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যে **কন্যাশ্রী** পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সফলতম প্রকল্প।

বাল্য বিবাহ নামক কুপ্রথা থেকে সমাজকে মুক্ত করার উদ্দেশ্য নিয়েই "**কন্যাশ্রী**" প্রকল্প শুরু। বাল্যবিবাহের ফলে মেয়েটি, তার পরিবার এমনকি তার পরবর্তী প্রজন্মও আর্থসামাজিক ভাবে পিছিয়ে পড়ে। কন্যাশ্রী প্রকল্প মেয়েদের আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি, আর্থিক স্বাধীনতা ও শিক্ষার প্রসারের জন্য পরিবারগুলোকে আর্থিক আনুদানের মাধ্যমে বাল্যবিবাহ বন্ধ করার উদ্যোগ নিয়েছে।

বাল্যবিবাহের বিলোপ ঘটিয়ে শিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কন্যাশ্রী প্রকল্পে শর্তসাপেক্ষে দুরকমভাবে টাকা দেওয়া হয়। প্রথমটি হল বাৎসরিক আনুদান (K1): অবিবাহিত থেকে পড়াশোনা চালিয়ে যাবে এই শর্তে ১৩ থেকে ১৮ বছর বয়সী অষ্টম শ্রেণী বা তার উপরের ক্লাসে পাঠরতা মেয়েদের বছরে ১০০০ টাকা করে দেওয়া হয়। দ্বিতীয়টি হল এককালীন অনুদান (K2): একই শর্তে ১৮ থেকে ১৯ বছর বয়সী মেয়েদের এককালীন ২৫০০০ টাকা দেওয়া হয়। এই মেয়েদের মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, প্রযুক্তিগত ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সহ উচ্চশিক্ষা ইত্যাদি যে কোনো এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠরতা থাকতে হবে। এই প্রকল্পের টাকা সরাসরি মেয়েদের নামে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা হয় আর এই অর্থনৈতিক স্বাধীনতার মধ্যে দিয়েই তাদের স্বনির্ভরতার ভিত তৈরি হয়।

কন্যাশ্রী প্রকল্প কেবলমাত্র একটি সামাজিক সুরক্ষা পদ্ধতিই নয়, এই প্রকল্পের লক্ষ্য হল এমন মেয়েদের গড়ে তোলা যারা স্বাধীন, আত্মবিশ্বাসী, সৃষ্টিশীল এবং সমাজে নিজস্ব জায়গা করে নিতে সক্ষম। এমন মেয়ে যাদের জ্ঞান ও দক্ষতা থাকবে। সমাজ পরিবর্তনের বাহক এই মেয়েরা।

তাই ব্যাঙ্ক আকাউন্টে টাকা পাঠাবার সাথে সাথে এই প্রকল্পে অতিরিক্ত কিছু 'ক্যাশপ্লাস' উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে যা কিশোরীদের ভাল থাকার সহায়ক। এই উদ্যোগগুলোর মধ্যে আছে ঋতুকালীন সময়ের স্বাস্থ্যবিধি, জীবনশৈলী ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ে সচেতনতা ও উদ্যোগ, নাগরিক অধিকার ও শিক্ষামূলক ভ্রমণের সাহায্যে ব্যাঙ্ক, পোস্টঅফিস ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানা ও অন্যদের জানানো।

সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিই বাল্য বিবাহের বিলুপ্তি সাধন করতে পারে। এর সঙ্গে দরকার নেটওয়ার্ক, যাতে করে মেয়েটি নিজেই অথবা তার কোনো বন্ধু সঠিক সময়ে খবর পৌঁছে দিয়ে বাল্যবিবাহের ঘটনা রুখতে পারে।

কন্যাশ্রী কিশোরীরা এই বয়সে সঙ্গী-সাথীদের উৎসাহ ও সমর্থন পেলে নিজেদের প্রয়োজন, আশা ও আকাঙ্খা প্রকাশ করতে পারে এবং নিজেদের বিকাশে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। সমবয়সীদের দলগঠন ও সক্রিয়তার মাধ্যমেই তারা নিজেদের বিকশিত করে তুলতে পারবে। তাই এই দপ্তর থেকে স্কুল ও এলাকার কিশোরী মেয়েদের দল গঠন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

পরিণত বয়সে পৌঁছেই মেয়েরা স্বাধীন ভাবে সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হয়, তাই ১৮ বছর পার করে তারা যে ২৫০০০ টাকা পায় সেই টাকা খরচের বিষয়টি তারা নিজেরাই ঠিক করে। অনেকে উচ্চশিক্ষার কাজে এই টাকা খরচ করে, অনেকে এই টাকা ভবিষ্যতের জন্য জমিয়ে রাখে বা ব্যবসার প্রাথমিক মূলধন হিসেবে ব্যবহার করে। এই টাকা কিভাবে খরচ হল সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হল 'কন্যাশ্রী' প্রকল্পের মাধ্যমে যে টাকা তারা পায় তা তারা নিজেদের ইচ্ছামতো খরচ করতে পারে। বাল্যবিবাহের বলি হলে নিজে স্বাধীন ভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অবস্থা তাদের থাকতো না।

ছোট ছোট বাস্তব ঘটনাবলী নিয়ে লেখা এই বইটি আগামী দিনে কন্যাশ্রী প্রকল্প ও এর সাথে যুক্ত মানুষদের কাছে প্রামাণ্য বই হিসেবে স্বীকৃত হয়ে থাকবে।

সঙ্ঘমিত্রা ঘোষ, আইএএস
সচিব,
নারী ও শিশু বিকাশ এবং সমাজ কল্যাণ দপ্তর,
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

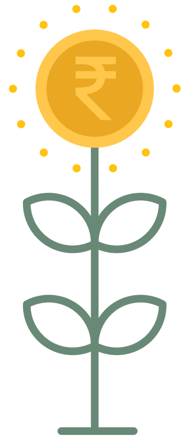

পরিণত বয়সে পৌঁছেই মেয়েরা স্বাধীন ভাবে সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হয়, তাই **১৮ বছর পার করে** তারা যে **২৫০০০ টাকা পায়** সেই টাকা খরচের বিষয়টি তারা নিজেরাই ঠিক করে।

ভূমিকা

কৈশোর' জীবনের এমন একটা সময় যখন বহু অভিজ্ঞতা হয় যা পরবর্তী কালে নিজস্ব বিকাশকে প্রভাবিত করে। এগুলো সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, ব্যাক্তিগত পরিচয় গড়ে তোলা, প্রাপ্তবয়স্ক সম্পর্ক ও ভুমিকা পালনের জন্য এবং বিমূর্ত যুক্তি গড়ে তোলার দক্ষতা অর্জন ইত্যাদি বিষয়ক হতে পারে।

এই সময় হল তাদের বড় হয়ে ওঠার ভিত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন – স্কুল, কলেজ, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং তাদের সামাজিক পরিবেশ কিশোরবেলার বিভিন্ন কাজের নিরাপদ পরিবেশ হিসাবে কাজ করে।

কৈশোর এমন একটা সময় যখন ছেলে ও মেয়েদের ভূমিকা পৃথক হয়ে যায় স্পষ্টভাবে। ছেলে ও মেয়েরা এই সময় সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হয়। মেয়েরা অনেক বেশি করে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করায় এবং তাদের সারাজীবনকে কে প্রভাবিত করে এমন সিদ্ধান্ত স্বাধীন ভাবে গ্রহণের ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হয়। ভারতে কিশোরীদের আর খারাপ অবস্থা হয় ঘরের কাজের অতিরিক্ত চাপ, যৌন হেনস্থা ও শোষণ, গৃহনির্যাতন, পড়াশোনায় ইতি টানা, রক্তাল্পতা ও খারাপ স্বাস্থ্যের কারণে। আর এগুলোর শেকড় রয়েছে বাল্যবিবাহ ও কৈশোরে গর্ভধারণ এর মধ্যে।

বাল্যবিবাহ সম্পর্কে আমরা কী জানি? আমরা জানি এর বলি হয় মূলত ১২ থেকে ১৫ বছরের কিশোরীরা। বাল্যবিবাহের ফলে তারা পরিণত হয় মূলত তাদের চেয়ে বয়সে অনেক বড় পুরুষের যৌন দাসীতে। বাল্যকাল থেকে প্রাপ্তবয়স্কবেলায় পৌঁছবার সন্ধিক্ষণটা ভালোভাবে বোঝার বদলে তাদের জোর করে গৃহদাসীতে পরিণত করা হয়। তাদের গৃহস্থালীর কাজ ও তাদের স্বামীদের পরিবারকে সামলাতে হয়। এসব করতে হয় এমন একটা সময় যখন তারা নিজেরাই ছোট। অনেক সময়েই তারা এসময় গর্ভধারণ করে ও ভীষণ কম ওজনের সন্তানের জন্ম দেয়। এ ধরনের কিছু বাচ্চা বা তাদের কিশোরী মা এক মাসের কম সময়েই মারা যায়। যারা বেঁচে যায়, তারা ভগ্ন স্বাস্থ্য, অশিক্ষার চক্রে প্রবেশ করে আর দারিদ্র্য থেকে তাদের বেরোনো মুশকিল হয়ে পড়ে।

বালিকা বধূদের পরবর্তী জীবনেও তাদের পরিবারে খুব কমই প্রভাব থাকে। তাদের শিক্ষার স্বল্পতার কারণে তারা না পরিবারে ভালো করে কথা বলতে পারে না দোকানে বাজারে। সমাজে তারা গুরুত্ব হারায় এবং এতে সমাজ আর পিছিয়ে পড়ে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও তারা পিছিয়েই থাকে। কিশোরীদের স্বাস্থ্যশিক্ষার অধিকার ও ভালো থাকায় ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। ব্যক্তি থেকে জাতীয় স্তরে

বাল্যবিবাহের অর্থনৈতিক প্রভাব সুদূরপ্রসারী। বাল্যবিবাহের ফলে জনসংখ্যা বাড়ে এবং তার সাথে বাড়ে শিক্ষার অসম্পূর্ণতা।

পশ্চিমবঙ্গে প্রতিটি কিশোরীর জন্য কন্যাশ্রী প্রকল্প একটি বার্তা বহন করে "বাল্যবিবাহে না বল, শিক্ষার দিকে এগিয়ে চল"। সংস্কৃতি ও রীতিনীতি যেখানে কিশোরীদের অসময়ে অসম বিয়ের দিকে ঠেলে দেয়, সেখানে এই মেয়েদের গল্পগুলিতে আমরা দেখবো সব বাধাকে দূরে ঠেলে প্রত্যেকেই তাদের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় পরিবার ও সমাজে তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছে।

ঘটনা গুলির পটভূমি মুর্শিদাবাদ, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও পূর্ব বর্ধমান জুড়ে। প্রতিটি গল্প একটি পরিবর্তনের যা কন্যাশ্রী প্রকল্পের সফল রূপায়নের মধ্য দিয়েই সম্ভব হয়েছে। এই গল্পগুলির অনেক ক্ষেত্রেই জেলার কিছু বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছে।উদাহরণ হিসাবে মুর্শিদাবাদ কেই ধরা যাক। কন্যাশ্রী যোদ্ধাদের তিনটি গল্পেই দেখা গেছে সকল বাধা সত্ত্বেও তারা স্কুলের পড়া শেষ করে কলেজে পড়ছে। এদের মধ্যে দুজন আয় করছে এবং এলাকার কিশোরীদের কাছে রোল মডেল হয়ে উঠেছে। কন্যাশ্রী এই দল মুর্শিদাবাদে 'কন্যাশ্রী যোদ্ধা' নামে পরিচিত। এটাই মুর্শিদাবাদের কন্যাশ্রী মেয়েদের বিশেষত্ব।

কোচবিহারে আমরা অগ্রণী একটি মেয়েকে দেখি গ্রামে অঙ্গনওইয়াড়ী-ভিত্তিক দলে নেতৃত্ব দিতে। কোচবিহার সেই সাতটি জেলার মধ্যে একটি যেখানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার অঙ্গনওয়াড়ী-ভিত্তিক মেয়েদের দল গঠন করে এই প্রকল্পের রূপায়ন করেছেন। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে অঙ্গনওইয়াড়ী-ভিত্তিক দল রয়েছে।

জলপাইগুড়িতে বেশিরভাগ স্কুল কর্তৃপক্ষই একথা জোর দিয়ে বলছেন যে কন্যাশ্রী প্রকল্প মেয়েদের স্কুলে ধরে রাখতে সাহায্য করেছে। বরং ছেলেরা কম বয়সে কাজ শুরু করে দেওয়ার কারণে অনেকেই এখন স্কুলের বাইরে। জলপাইগুড়ি শহরের একজন শিক্ষক বলেছেন, "আমাদের স্কুলটা কো-এড, কিন্তু উঁচু ক্লাসগুলোতে গেলে আপনার মনে হবে যেন এটা যেন বালিকা বিদ্যালয়। ক্লাসে কোনো ছেলে নেই কারন তারা ১৪-১৫ বছর বয়স থেকে কাজ শুরু করে দেয়।"

অন্যদিকে, ভাতার ব্লক, পূর্ব বর্ধমানের একজন কন্যাশ্রী নোডাল শিক্ষকের কথায় তারা ১০ শতাংশ মেয়েদের বিয়ে বন্ধ করেছে। এদের অনেকেই দূরে চলে গেছিল। ১৮ বছরের আগে মেয়েদের বিয়ে দেবেনা এমন হলফনামায় সই করার পরও পরিবার মেয়ে কে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল বিয়ে দেবার জন্য। পরে সেই বিয়ে বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে।

পরের বিভাগগুলিতে সংক্ষেপে প্রতিটি জেলার পটভূমিতে কন্যাশ্রী প্রকল্পের বর্ণনা করা হয়েছে।

দূরের জায়গাগুলিতে গিয়ে বাল্যবিবাহ বন্ধ করা ভালো আবহাওয়াতেও কষ্টকর, **কারণ দূরের গ্রামপঞ্চায়েতগুলিতে যেতে অন্ততঃ ঘন্টাদুয়েক লেগে যায়।**

মুর্শিদাবাদ

ভারত বাংলাদেশ বর্ডারে অবস্থিত চারটি মূল নদীর অববাহিকায় এই জেলার অবস্থান হওয়ায় এলাকা গুলির মধ্যে দূরুত্ব বেড়েছে প্রচুর। প্রতি বছর এই এলাকা গুলি মাসখানেক ধরে বন্যার জলে ডুবে থাকে, ফলে দুর্গম জায়গাগুলোয় যাওয়া জেলা প্রশাসনের পক্ষেও অনেক ক্ষেত্রে দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। দূরের জায়গাগুলিতে গিয়ে বাল্যবিবাহ বন্ধ করা ভালো আবহাওয়াতেও কষ্টকর, কারণ দূরের গ্রামপঞ্চায়েতগুলিতে যেতে অন্ততঃ ঘন্টাদুয়েক লেগে যায়। এরকম পরিস্থিতিতে স্থানীয় অঞ্চলেই বিষয়গুলি মিটিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করে জেলা। এইভাবে ২০১৪ সালে কন্যাশ্রী প্রকল্প শুরু হওয়ার পরের বছরই কন্যাশ্রী যোদ্ধাদের উদ্যোগ শুরু হয়।

‘কন্যাশ্রী যোদ্ধা’ গঠনের ধারণাটি তৎকালীন মুর্শিদাবাদ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট-এর ভাবনা থেকে সৃষ্টি।

বর্তমানে কন্যাশ্রী যোদ্ধারা জেলার সব ব্লকেই রয়েছে। ২০১৭ থেকে জেলা প্রশাসনের ‘সোস্যাল বিহেভিয়ার চেঞ্জ কমিউনিকেশন সেল’ নিরাপদ স্বাস্থ্যবিধি, নিরাপদ মাতৃত্ব সহ অন্যান্য বিষয়ের বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে তাদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। তাদের প্রাথমিক ভূমিকা হলো বাল্যবিবাহ, শিশু নির্যাতন, শিশু পাচার বন্ধ করা ও স্কুলছুটদের স্কুলে ফেরানো।

জেলার বিভিন্ন অংশে অনেক পড়ুয়া আছে যারা স্কুলছুট। পরিবারের দারিদ্র্যের কারণে ১১-১২ বছরের বাচ্চারা বিড়ি তৈরি করতে শুরু করে। এই বয়সের বাচ্চারা বাড়িতে থেকেই মাসে ৪০০০ টাকা আয় করতে পারে বিড়ি বেঁধে। বিড়ি এজেন্টরা পাতা, তামাক আর সুতো এইসব কাঁচামাল নিয়ে আসে আর তৈরি জিনিস নিয়ে যায় হাতে হাতে টাকা দিয়ে। মুর্শিদাবাদের গ্রামে বিড়ি তৈরি করা একটি মুখ্য কুটির শিল্প। এই কারণেই বাচ্চারা স্কুল ছেড়ে দেয়। এখনকার অনেক ‘কন্যাশ্রী যোদ্ধাই’ একসময়কার স্কুলছুট, কারণ তাদের পরিবার তাদের আয়ের উপর নির্ভর করতো।

‘কন্যাশ্রী যোদ্ধা’রা গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে পঞ্চায়েত সদস্যের এলাকার প্রতিনিধিত্ব করে। প্রতি সীট এর প্রতিনিধিত্ব করে দুজন কন্যাশ্রী; তাদের মধ্যে একজন গ্রামের একটি করে ছেলের সাথে গ্রাম স্তরের শিশু সুরক্ষা কমিটির সদস্য। গ্রাম পঞ্চায়েতে ১৫-২০ টি সীট তাই প্রতিটিতে ৩০-৪০ জন কন্যাশ্রী যোদ্ধা। এই দল শক্তিশালী, তারা সামাজিক পরিবর্তনকারী ও সমাজের সম্পদ। যোদ্ধারা ব্লকের প্রথম সারির সেনা এবং তারা গ্রাম স্তরে রাজ্য সরকারের অন্যান্য সামাজিক কার্যক্রম – যেমন স্বাস্থ্যবিধি, অপুষ্টি এবং ডেঙ্গু/ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রন এর মত নানা কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। কিছু গল্পে দেখা যাবে গ্রামের অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী ও স্বাস্থ্যকর্মী দুজনেই কন্যাশ্রী যোদ্ধাদের থেকে অনেক সাহায্য পান।

বি ডি ও-রাও যোদ্ধাদের থেকে পাওয়া সাহায্যকে স্বীকার করেন। যখন গ্রামের একজন শিক্ষিত মেয়ে, মানুষের দরজায় এসে বাচ্চাদের টিকাকরণ বা মশাদের ডিম পাড়ার জায়গা নষ্ট করে ফেলা নিয়ে কথা বলে, তখন তা মানুষ গুরুত্ব দিয়ে শোনে, বলেন মুর্শিদাবাদের খড়গ্রাম ব্লকের বি ডি ও। কন্যাশ্রীদের সাহায্য নেওয়া হয় খোলা জায়গায় মলত্যাগ রুখতে ও ডেঙ্গু/ম্যালেরিয়া রুখতে মশার জন্ম বন্ধ করার সচেতনতার বিস্তার করতে। এইজন্যই এরা যোদ্ধা। বি ডি ও বলেন, গ্রামের নানান সমস্যার বিরুদ্ধে লড়াই করে এই কন্যাশ্রীরা।

একজন ব্লক অফিসার কিভাবে বাল্যবিবাহ রুখতে কন্যাশ্রীদের থেকে তথ্য সাহায্য পান তা বলতে গিয়ে খড়গ্রামের বি ডি ও বলেন,”ওদের কাছ থেকেই আমরা অগ্রিম খবরটা পাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। এই মেয়েরা গ্রামে থাকে এবং যার বিয়ে দেওয়া হচ্ছে সেই

বালিকাটি তাদের চেনা পরিচিত। তাই সাধারণত সময় থাকতে থাকতেই যোদ্ধারা জানতে পেরে যায় কোন পরিবারে নাবালিকা মেয়ের বিয়ে হতে চলেছে। তখন তারা ফোন করে খবরটা আমাদের দেয়।

আর একটি সমস্যাও আছে। আইনত আমাদের কনে ও বরের দুজনের বাবাকেই গ্রেফতার করার কথা। কিন্তু মানবিক কারনবশতঃ আমরা তা করিনা। ভালো করে বুঝিয়ে ও শপথপত্র নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয় তাঁদের। তা সত্ত্বেও কিছু বাবা মা মেয়েকে অন্য ব্লক বা কোনও আত্মীয়র বাড়ি নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন,' বি ডি ও বলেন।

সুতি ২ ব্লকের বি ডি ও বলেন, তিনি প্রতি সপ্তাহে পাঁচ ছয়টি বাল্যবিবাহ আটকান। "একটা গরিব পরিবারে যদি ছ'জন মেয়ে থাকে, তাদের মা-বাবারা তাড়াতাড়ি তাদের বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন।তারা মেয়ের ১৮ বছর হওয়া অবধি অপেক্ষা করতে চান না। ভালো খবর এই যে কন্যাশ্রী প্রকল্প চালু হওয়ার পর এরকম দৃষ্টান্ত ক্রমশই কমে চলেছে" বি ডি ও জানান।

কোচবিহার

পূর্ব হিমালয়ের পাদদেশে কোচবিহার অবস্থিত। এখানে গরমকাল ছোট এবং শীতকালে অনেক সময় ১০ ডিগ্রীর কম ঠাণ্ডা পড়ে। ছোট বাচ্চাদের ঠাণ্ডায় কষ্ট পেতে দেখে এখানকার কন্যাশ্রী ক্লাব পোশাক ব্যাঙ্ক স্থাপন করে পুরোনো জামাকাপড় নতুনের মতো পরিষ্কার করে নিয়ে সেগুলো বিতরণের ব্যবস্থা করেছে।

কোচবিহার মুলতঃ গ্রামপ্রধান জেলা যার ১২ টি ব্লক। এখানে ছ'টি জেলার সাথে রাজ্য সরকার অঙ্গনওয়াড়ী ভিত্তিক কিশোরীদের দল প্রথমে গড়ে তুলেছে। গ্রামের এই দল সপ্তাহে একবার অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে মিলিত হয় এবং অঙ্গনওয়াড়ী কর্মীদের তত্বাবধানে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে ও কাজ করে। ব্যাক্তি বা সম্প্রদায়ের যেসব সমসা নিয়ে তারা আলোচনা করে তার মধ্যে রয়েছে কিশোরীদের প্রজননমূলক সমস্যা ইত্যাদি, এগুলো তারা বাড়িতে

আলোচনা করতে লজ্জা পেতে পারে। তারা সামাজিক মানচিত্র তৈরী করে যাতে বোঝা যাবে কোন এলাকার মেয়েরা রক্তাল্পতায় ভোগে বা কারা স্কুলছুট। এছাড়া দ্বাদশ শ্রেণীর পর ছাত্রীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

জলপাইগুড়ি

ভুটান, আসাম ও বাংলাদেশের মাঝে অবস্থিত এই জেলার চারিদিকে চা বাগান। সবুজ ঝোপগুলো দেখতে সুন্দর কিন্তু সেই সৌন্দর্যের আড়ালে এ জেলার কঠিন বাস্তব লুকিয়ে আছে। ছেলেরা খুব কম বয়সে চা বাগানে কাজ শুরু করে। গ্রামে চা বাগানে কাজ করাই মানুষের মূল পেশা। শিক্ষক আর ব্লক অফিসারদের বক্তব্য অনুযায়ী স্কুলের উঁচু ক্লাসে মেয়েদের সংখ্যা বেশি কারণ ছেলেরা ১৪-১৫ বছর বয়সেই কাজ শুরু করে দেয়।

পূর্ব বর্ধমান

এই জেলার বেশিরভাগ স্কুলেই কন্যাশ্রী মেয়েদের ক্লাস ঘরের বাইরে এক বৃহত্তর ভূমিকা গ্রহণ করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। তারা বাল্যবিবাহের প্রতিরোধে নাটকে অভিনয় করে, ঋতুকালীন স্বাস্থ্যবিধি নিয়ে প্রচার করে এবং স্কুলের ঘর ব্যবহার করে তারা সফলভাবে বয়স্কদের সাক্ষরতার ক্লাসও চালায়।

প্রতিবছর ১৪ই আগস্ট 'কন্যাশ্রী দিবস'এ আড়ম্বরের সাথে জেলা প্রশাসন এই কাজগুলিকে উৎসাহ দেন। পুরষ্কার হিসাবে টাকা বা অন্যভাবে স্বীকৃতি দিয়ে এই বার্ষিক অনুষ্ঠান ও অন্যান্য স্বীকৃতিমূলক অনুষ্ঠান মেয়েদেরকে সামাজিক বদ্ধতার খোলস মুক্ত হয়ে নতুন ভাবে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন জীবন যাপনে উৎসাহ দেয়। তারা নিজেদের মধ্যে নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা খুঁজে পায় ও সেটা আবিষ্কার করে আরও আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে।

কন্যাশ্রী প্রকল্প কী অর্জন করেছে?

মুর্শিদাবাদের স্কুল শিক্ষিকা বলেন পাঁচ বছর আগেও যেখানে দ্বাদশ শ্রেণীতে ১০০ জন ছাত্রের মধ্যে ২০ জন বিবাহিতা মেয়ে দেখা যেতো, এখন ২-৩ জনের বেশি বিবাহিতা মেয়ে দেখা যায় না। "কয়েক বছর আগে অবধি এই অঞ্চলের বেশিরভাগ মেয়েরই ১৫ বছরের মধ্যে বিয়ে হয়ে যেত", জানান রায়নগর ব্লকের (মুর্শিদাবাদ জেলা) কন্যাশ্রী'র নোডাল অফিসার। "আজ অবশ্য বাল্যবিবাহ প্রচলন নয়, ব্যতিক্রম হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেখানে এই প্রথাটি কিছুদিন আগে পর্যন্তও প্রবল ছিল এটা সেইসব জায়গার ক্ষেত্রেও সত্যি", তিনি যোগ করেন।

বাল্যবিবাহ যে ক্রমশঃ বন্ধ হতে চলেছে সে বিষয়ে সকলেই সহমত। শিক্ষক, বি ডি ও, কন্যাশ্রী মেয়েরা সকলে এককথাই তাই বলেন। তবে এখনও কিছু মেয়ে রয়েছে যাদের কন্যাশ্রী সঙ্গী ও প্রশাসনের চোখের আড়ালে অন্য এলাকায় নিয়ে গিয়ে বিয়ে দেওয়া হয়। এই মেয়েদের নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে। কোচবিহারের নোডাল অফিসার বলেন যেসব মেয়েরা ১৩ বছরে কন্যাশ্রীতে নাম লেখায় তাদের সবাই ১৮ বছর হওয়ার পর এককালীন অনুদান দাবী করে না। খুব অল্প সংখ্যক হলেও তারা বাদ যায়। এর একটা কারণ বাল্যবিবাহ হতে পারে।

"এই পরিস্থিতিতে লোকেদের বাল্যবিবাহের বিরূপ প্রভাবের বিষয় সচেতন করা অত্যন্ত জরুরি", বলেন বড়বেলুন দেবীবালা বালিকা বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল। তিনি এটাও বলেন যে নাটকের মাধ্যমে এই কাজটা অনেক সহজেই করা যায়। তাঁর স্কুলের কন্যাশ্রীরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে নাটক করে জনগণকে সজাগ করে তুলছে। 'এই নাটক দেখার পর বাল্যবিবাহের প্রতি প্রাণে ভয় ধরতে বাধ্য,' প্রিন্সিপাল বলেন।

1

নাজেমা খাতুন, ২১,
কন্যাশ্রী যোদ্ধা, সুতি ২,
মুর্শিদাবাদ

এই প্রাক্তন বালিকাবধূ এখন একজন প্রতিবাদী মেয়ে

নাজেমা তার এলাকায় বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেতৃত্ব দানকারী একজন যোদ্ধা

নাজেমা একজন কন্যাশ্রী যোদ্ধা। সে তার দলের অন্যান্য যোদ্ধাদের নিয়ে অনেক বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে নেতৃত্ব দিয়েছে; স্কুলছুট অনেককে এই দল আবার পড়াশোনায় ফিরিয়ে এনেছে। মাত্র আট বছর আগে, নাজেমা নিজে ছিলো একজন বালিকা বধূ। তার যখন মাত্র ১৩ বছর বয়স তখন তার পরিবার তার বিয়ে দিয়ে দেয়। সে তখন ক্লাস ৫ এ পড়তো। তার পড়া বন্ধ হয়ে যায়।

নাজেমা তার দাদু দিদার কাছে বড়ো হয়েছে। তার বাবা যখন দ্বিতীয়বার বিয়ে করলেন, তার মা নাজেমা, তার দুই বোন ও ভাইকে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে আসেন। 'তখনকার দিনে লোকে অতো জানতো না যে শিশুদের বিয়ে দেওয়া বে-আইনি। বাল্যবিবাহের খারাপ প্রভাব বা বিয়ের আইনি বয়স সম্পর্কে জানতো না তারা,' নাজেমা বলে। 'আমার পরিবারের কেউ শিক্ষিত নয়; কেউ নাম পর্যন্ত সই করতে পারে না। আমি আমার চারপাশের সবাইকে খুব অল্প বয়সে বিয়ে হতে দেখেছি।'

নাজেমার বিয়ে মাত্র দু'মাস টিকেছিলো। বাড়িতে এসে সে বলে, তার ১৬ বছর বয়সী স্বামী অন্য একজনকে ভালোবাসে এবং এ'কথা পরিষ্কার বলে দিয়েছে যে নাজেমার কথা ভাবার সময় তার নেই। নাজেমার শাশুড়ি নাজেমাকে দিয়ে সকলের জামাকাপড় কাচা, সকাল বিকেল বাসন মাজা ও বাড়িঘর পরিষ্কার রাখা ইত্যাদি ঘরের সব কাজ করাতো। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত ঐ তেরো বছরের মেয়েটিকে যা যা বলা হতো তাই সে করতো। সন্ধ্যেটা ছিলো সবচেয়ে খারাপ সময়। কারণ, নাজেমার স্বামী এবং শ্বশুর একসাথে বসে মদ খেতো। এটা নাজেমার কাছে একটা মানসিক ধাক্কা ছিলো, কারণ সে এর আগে কাউকে বাড়িতে মদ খেতে দেখেনি। কয়েক গ্লাস মদ খাবার পর বাবা ও ছেলে তাকে সাংঘাতিক গালিগালাজ করতো। তাতে কখনো কখনো তার শাশুড়িও যোগ দিতো। তিনজনে যখন একসাথে তার বিরুদ্ধে গালিগালাজ করতো এবং অশ্রাব্য ভাষা বলতো তখন নাজেমা ভয়ে ঠান্ডা হয়ে যেতো। এটা ছিলো রোজ সন্ধ্যের ঘটনা। পুরোনো দিনের কথা মনে করে নাজেমা বলে, 'ওরা আমার গায়ে হাত দেয়নি এটা ঠিক, কিন্তু অনেক কষ্ট দিয়েছে। শ্বশুরবাড়িতে থাকতে আমি নিঃশ্বাস নিতে অবধি ভয় পেতাম।'

নাজেমা যখন প্রথমবার বাড়িতে এসে তার নানা নানিকে তার বিবাহিত জীবনের কথা বলে তখন তাঁরা বুঝতে পারেন যে তারা একটা বড়ো ভুল করে ফেলেছেন। নানা নানি ঠিক করেন তারা নাজেমাকে তার স্বামীর বাড়িতে আর পাঠাবেন না। তারা ইসলামিক মৌলবীদের কাছে বিষয়টি নিয়ে যান এবং তাঁরা নাজেমার ডিভোর্স (তালাক) অনুমোদন করেন।

নাজেমা গ্রামে তার মা, নানা, নানির সাথে আগের জীবনে ফিরে এলো। যদিও সে তখন স্কুলে ফিরলো না আর বাড়িতেই রয়ে গেলো। তার জীবন এক নতুন দিশা পেলো যখন একটি স্থানীয় এন জি ও-র ব্লক কো-অর্ডিনেটর বাড়ি বাড়ি গিয়ে সমীক্ষা চালাতে গিয়ে তাকে স্কুল ছুট ছাত্রী হিসেবে চিহ্নিত করলেন। এন জি ও-টির সাহায্যে সে অ-প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ওপর একটি সরকারী ব্রিজ কোর্স করলো এবং তার আগের স্কুলে ক্লাস এইট এ আবার ভর্তি হলো। স্কুলে ফিরে সে কন্যাশ্রীতে নাম লেখালো। এখন নাজেমা ব্যাচেলর ডিগ্রী করছে।

তার জীবন এক নতুন দিশা পেলো যখন একটি স্থানীয় এন জি ও-র ব্লক কো-অর্ডিনেটর বাড়ি বাড়ি গিয়ে সমীক্ষা চালাতে গিয়ে তাকে স্কুল ছুট ছাত্রী হিসেবে চিহ্নিত করলেন।

বাল্যবিবাহ বন্ধ করার জন্য মানুষকে সচেতন করতে নাজেমা বাড়ি বাড়ি গিয়ে কথা বলছে।

বীরাঙ্গনা পুরষ্কার সহ নাজেমা (ওপরে), কন্যাশ্রী যোদ্ধারা (নীচে)

নাজেমা আরো বলে যে, যখন সে ১৬ বছরের হলো, তার নানা নানি তার জন্য আরেকটি বিয়ের প্রস্তাব আনলেন, কিন্তু এবার সে আরো ভালো জানতো। সে তখন একজন কন্যাশ্রী; এই প্রকল্পের মাধ্যমে সে বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে জানতে পেরেছে। এই বিয়ে রুখতে নাজেমা তার স্কুলকে পাশে পেয়েছিলো। নাজেমা বিয়ের প্রস্তাব সরাসরি নাকচ করে; সে তার মা এবং নানা নানিকে বিয়ের বৈধ বয়স জানায় এবং কেনো সে এতো তাড়াতাড়ি বিয়ে করতে চায় না তাও জানায়। সে তার স্কুলের কন্যাশ্রী নোডাল শিক্ষক ও প্রিন্সিপালকে তার পরিবারের কাছে আনে কথা বলার জন্য। 'তারপর থেকে আমার পরিবার আমার সঙ্গে বিয়ের ব্যাপারে আর আলোচনা করে না,' মৃদু হেসে জানায় নাজেমা।

২০২০-র জানুয়ারী থেকে নাজেমা 'অ্যাকশন এইড' নামে একটি অ-লাভজনক সংস্থার সাথে কিশোরীদের জন্য গ্রাম স্তরে কাজ করছে। কন্যাশ্রী যোদ্ধা হিসেবে সে যা করে এসেছে, যেমন বাল্যবিবাহ রোধ করা এবং স্কুলছুটদের স্কুলে ফিরিয়ে আনা, এখানেও সে তা করে। কাজের সময় নমনীয় হওয়ার কারণে তার কলেজে পড়ার অসুবিধে হচ্ছে না আর এই পড়া শেষ করতে সে বদ্ধপরিকর।

নাজেমার পরিবার নাজেমা ও তার কাজ নিয়ে যথার্থই গর্বিত। তার মামা তাদের বাড়ির দেওয়ালে সাজিয়ে রাখা ট্রফিগুলো দেখিয়ে গর্বভরে বলেন, 'এগুলো সবই নাজেমার জেতা।' চোখ মুছতে মুছতে আবেগ ভরা স্বরে নাজেমার মা বলেন, 'কে ভেবেছিলো নাজেমা একদিন চাকরি করবে। একটা ছেলের চেয়ে ও কোনো অংশে কম না।'

এই পুরষ্কারগুলোর বেশিরভাগই বাল্যবিবাহ রোখার জন্য। 'আমরা অনেক, অনেক বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে পেরেছি,' নাজেমা বলে। সে অনেক পুরষ্কার ও সম্মাননা শংসাপত্র পেয়েছে। বাল্যবিবাহ রুখতে সচেতনতা তৈরীর চেষ্টার জন্য সে মর্যাদাপূর্ণ বীরাঙ্গনা পুরষ্কার পেয়েছে। এই পুরষ্কার দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা নিগম (West Bengal Commission for Protection of Child Rights)।

কন্যাশ্রী - পরিবর্তনের

গল্প

2

শান্তানুর আহসানিয়া, ১৯,
কন্যাশ্রী যোদ্ধা,
কালিনগর গ্রাম, রায়নগর,
মুর্শিদাবাদ

‘আমি একজন যোদ্ধা’

শান্তানুর আর তার দল এলাকায় ১২ টি বাল্যবিবাহ আটকে দিয়েছে

১৮ বছরের অবিবাহিতা পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া কন্যাশ্রী শান্তানুর সবেমাত্র কন্যাশ্রীর ২৫,০০০ এককালীন টাকা পেয়েছে। সে বর্তমানে ব্যাচেলর ডিগ্রী পড়ছে এবং শারীরশিক্ষাকে বিষয় হিসাবে বেছে নিয়েছে, কারণ তার স্বপ্ন হলো একদিন পুলিশে যোগ দেওয়া। সে তার এলাকায় কন্যাশ্রী যোদ্ধাদের নেত্রী। গত তিন বছরে তার দল ১২ টি বাল্যবিবাহ রুখতে পেরেছে। ২০১৬ সালে সে যখন যোদ্ধা হয়, তখন সে ছিলো কোমনগর হাই মাদ্রাসা স্কুলের ছাত্রী।

শান্তানুর বাল্যবিবাহ রুখতে গিয়ে অনেক ঝুঁকি নিয়েছে। তার বাবা চেন্নাইতে রাজমিস্ত্রির কাজ করেন। তিনি বছরে নয় মাসই বাইরে থাকেন। বাড়িতে শান্তানুর, তার মা ও দিদি থাকে। ‘আমার প্রতিবেশীরা বলে আমার যোদ্ধা হিসেবে কাজ করা উচিত নয়, এতে আমার পরিবারের ক্ষতি হতে পারে। বিশেষ করে আমার বাবা যখন বেশিরভাগ সময় চেন্নাইতে থাকেন। কিন্তু আমি এ’সবকে পাত্তা দিই না’ শান্তানুর পরিষ্কার বলে। সে ভয় পায় না। তার লড়াই করার ক্ষমতা আছে।

‘আগে এই অঞ্চলে বহু নাবালিকা মেয়েদের বিয়ে হতো। বেশিরভাগ মেয়েরই ১৩-১৪ বছর বয়েসে বিয়ে হতো। কিন্তু কন্যাশ্রী প্রকল্পের দৌলতে এখন আর তা হয়না।’

– কন্যাশ্রী নোডাল অফিসার.

মা ও বাবার সাথে শান্তানুর

শান্তানুর বলে তার মোবাইলে বি ডি ও এবং স্থানীয় থানার অফিসার-ইন-চার্জ-এর ফোন নম্বর রয়েছে। এটা তাকে সাহস দেয়। প্রথম সে বাল্যবিবাহ বন্ধ করে ২০১৭ সালে। তার স্কুল থেকে আটজন কন্যাশ্রী যোদ্ধা ১৬ বছর বয়সী একটি মেয়ে যার বিয়ে হতে চলেছিলো তার পরিবারে যায়। মা বাবা জোর করে মেয়েটির বিয়ে দেবেই বলে এবং কন্যাশ্রীদের চলে যেতে বলে এবং বলে এতে তাদের নাক না গলাতে। ‘তারা আমাদের সাথে খুব খারাপ ব্যবহার করে ও গালিগালাজ করে। তাদের বক্তব্য ছিলো বিয়ের আইনী বয়স নিয়ে তাদের মাথাব্যথা নেই। তাদের মেয়ে দেখতে সুন্দর এবং কম বয়সেই তার জন্য ভালো পাত্র পাওয়া যাবে।‘ বলে শান্তানুর। তারা নিজেরা বিয়ে আটকাতে না পেরে বাধ্য হয়ে বি ডি ও কে ফোন করে, যিনি তাঁর দলের সাথে পুলিশও পাঠান ও বিয়ে আটকানো হয়।

‘আমি একজন যোদ্ধা’ শান্তানুর বলে। ‘ব্লক আধিকারিক এবং পুলিশ অফিসারদের কাছ থেকে আমি যে সাহায্য পাই, সেটাই আমার ঢাল তলোয়ার।‘ যোদ্ধারা এখন ভালোভাবে প্রস্তুত। তারা যদি মনে করে তারা নিজেরা কোনো পরিস্থিতি সামলাতে পারবে না, তবে তারা বি ডি ও এবং পুলিশের কাছে সাহায্য চেয়ে ফোন করে।

‘এতে অনেক ফল পাওয়া গেছে, জানান ব্লকের কন্যাশ্রী নোডাল অফিসার। ‘আগে এই অঞ্চলে বহু নাবালিকা মেয়েদের বিয়ে হতো। বেশিরভাগ মেয়েরই ১৩-১৪ বছর বয়েসে বিয়ে হতো। কিন্তু কন্যাশ্রী প্রকল্পের দৌলতে এখন আর তা হয়না।’

পাঁচ ছয় বছর আগে খুব কম মেয়েই ১২ ক্লাস পর্যন্ত পড়াশোনা করতো এবং তারপরও বেশিরভাগেরই বিয়ে হয়ে যেতো।‘ ব্লক নোডাল ব্যক্তি বলেন, ‘তবে এখন ছবিটা একেবারে আলাদা। আজকের পরিস্থিতি এই যে কোমনগর হাইমাদ্রাসা স্কুলের ১০০ জন ক্লাস ১২ এর ছাত্রীদের মধ্যে আপনি দেখতে পাবেন যে মাত্র দুই বা তিনজন বিবাহিত।’

কন্যাশ্রী - পরিবর্তনের

গল্প

3

সাহানারা খাতুন, ২২,
কন্যাশ্রী যোদ্ধা, সুতি ২,
মুর্শিদাবাদ

এই একদা স্কুলছুট মেয়েটি এখন স্কুলে না পড়া বাচ্চাদের শিক্ষিকা

তার জীবনের একটি বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়েছে কারণ সে এখন অন্য বাচ্চাদের প্রথাগত শিক্ষায় আবার যোগ দেবার কাজে সাহায্য করছে

সাহানারা খাতুন একজন ভালো বক্তা। সে যখন এলাকায় মানুষদের সামনে স্কুলের শিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে কথা বলে, মানুষ মন দিয়ে তার কথা শোনে। সমাজ তাকে মর্যাদা দেয়। তারা দেখেছে সাহানারাকে বাল্যবিবাহ আটকাতে; তারা দেখেছে তার একটি ফোন কলে জেলা আধিকারিক ও পুলিশ গ্রামে চলে আসেন বাল্যবিবাহ আটকাবার জন্য। যদিও তার এলাকার অনেক বাচ্চাদের মতোই সাহানারা ছিলো স্কুলছুট একটি ছাত্রী। সৌভাগ্যবশতঃ, প্রায় চার বছর পর সে আবার স্কুলে ফিরতে পারে এবং উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে। বর্তমানে সে কলেজে পড়ছে।

ক্লাস ফাইভে পড়ার সময় থেকে সাহানারার সংগ্রাম শুরু। তার পরিবারের আর্থিক অবস্থা এতো খারাপ ছিলো যে সে বাধ্য হয়েছিলো রোজগারের আশায় বিড়ি তৈরীর কাজ শুরু করতে। স্বাভাবিকভাবে তার স্কুলে পড়া বন্ধ হলো কারণ তখন স্কুলে বিনে পয়সায় খাতা, কলম ইত্যাদি দেওয়া হতো না; কয়েকটি মাত্র বই বিনে পয়সায় দেওয়া হতো। সাহানারার নয় বোন এবং দুই ভাই

সে প্রতি মাসে ৬,০০০ টাকা রোজগার করে। তার গ্রামের একজন প্রতিষ্ঠিত নেত্রী সে। আজকের জায়গায় পৌঁছতে তাকে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হয়েছে।

মুর্শিদাবাদ জেলায় বিড়ি বানিয়ে অনেকেই ১,০০০ বিড়ি প্রতি ১৫০ টাকা করে পান।

ছিলো। ১৪ জনের পেট চালাতে সাহানারার সব ভাইবোন ছোটোবেলা থেকে রোজগার শুরু করেছিলো। মুর্শিদাবাদ জেলায় বিড়ি তৈরী করে অনেকেই, এই কাজে প্রতি ১,০০০ বিড়ি বাঁধলে ১৫০ টাকা আয় করা যায়। একটি বাচ্চা তাই মাসে ৪,০০০ টাকা অনায়াসেই রোজগার করতে পারে।

একটি স্থানীয় এন জি ও তাদের সমীক্ষা চালাতে গিয়ে দেখে সাহানারা একজন স্কুলছুট ছাত্রী, তারা তখন তার মা বাবাকে বললেন তারা সাহানারাকে বিনে পয়সায় পড়াবেন এবং বই, খাতা ইত্যাদিও দেবেন। সাহানারা তার মা বাবার কাছে মিনতি করলো যাতে তাকে পড়তে দেওয়া হয়। সে তার মা বাবাকে এমনও বললো যে সে রোজ ১,০০০ করে বিড়ি বেঁধে দেবে। তার মা বাবা রাজি হয়ে গেলো। সে এন জি ও –র কোচিং ক্লাসে পড়া এবং পরিবারের জন্য রোজগার দুই–ই চালাতে থাকলো। দু বছর পর সাহানারা সফলভাবে ব্রিজ কোর্স শেষ করলো এবং স্কুলে পড়ার জন্য তৈরী হয়ে গেলো। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ, তার স্কুলে ভর্তির আবেদন খারিজ হয়ে গেলো বয়স বেড়ে যাওয়ার কারণে।

'যখন জানতে পারলাম যে আমার আবেদন বাতিল হয়ে গেছে, আমি খুব কেঁদেছিলাম,' সাহানারা জানায়। 'এতো চেষ্টার পর কি অতো সহজেই হার মেনে নেওয়া যায়?' সে সাহস সঞ্চয় করে ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার বা বি ডি ও–র সামনে গিয়ে নিজের বিষয়টি জানালো। 'অনুগ্রহ করে আমাকে স্কুলে পড়তে দিন; এটা আমার স্বপ্ন,' সে অনুরোধ করলো। ব্লক অফিসে গিয়ে বি ডি ও–র সাথে দেখা করা ছিলো সাহানারার পক্ষে একটি বিরাট পদক্ষেপ। তার পড়াশোনা করার ইচ্ছে দেখে বি ডি ও স্কুলকে লিখলেন তার স্কুলে ভর্তিকে একটি স্পেশাল কেস হিসাবে দেখতে।

আজ সাহানারার জীবনের একটি বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়েছে। কলেজের পড়াশোনার পাশাপাশি, সে স্কুলছুটদের স্থানীয় কোচিং সেন্টারে পড়ায়, যাতে তারাও স্কুলে আবার গিয়ে ভর্তি হতে পারে। এলাকার কিশোরীদের কাছে সে একজন পথিকৃৎ স্বরূপ। সে প্রতি মাসে ৬,০০০ টাকা রোজগার করে। তার গ্রামের একজন প্রতিষ্ঠিত নেত্রী সে। আজকের জায়গায় পৌঁছতে তাকে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হয়েছে।

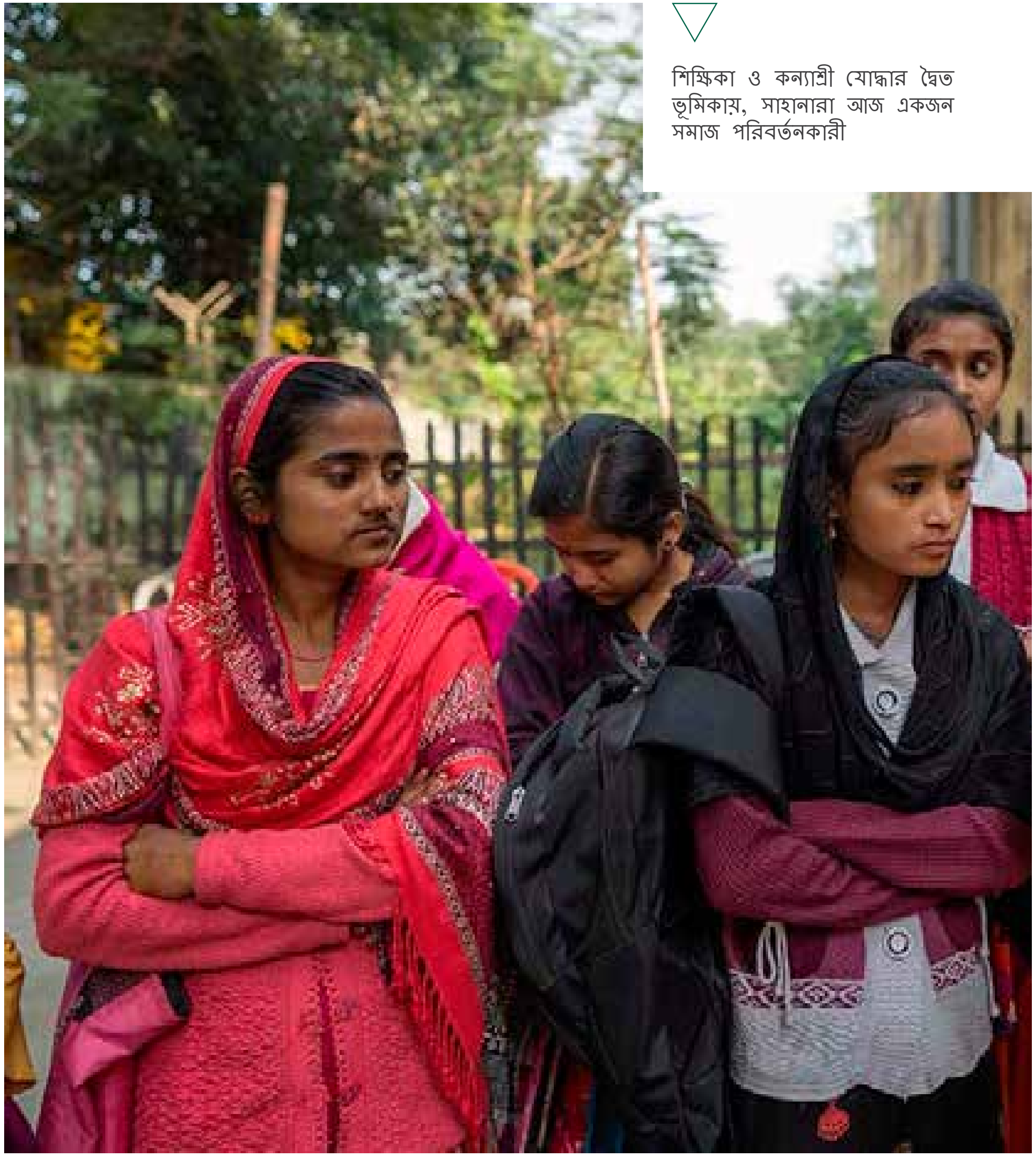

শিক্ষিকা ও কন্যাশ্রী যোদ্ধার দ্বৈত ভূমিকায়, সাহানারা আজ একজন সমাজ পরিবর্তনকারী

'কন্যাশ্রী যোদ্ধা' হিসাবে, সাহানারা বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সামনের সারিতে রয়েছে। সে চার বছর আগের একটি ঘটনা বলে যখন সে সহ ১৫ জন যোদ্ধা একটি বাচ্চা মেয়ের বাড়িতে তার বিয়ে আটকাতে যায়। তারা যখন পরিবারটিকে বোঝাবার চেষ্টা করছিলো তখন তাদের ধাক্কা দেওয়া হয় ও মারধোর করা হয়। যোদ্ধারা এরপর বি ডি ও-র কাছে যায় এবং ব্লকের কিছু কর্মী ও তার পিছু পিছু পুলিশ নিয়ে আবার ফিরে আসে ও বিয়েটা আটকাতে সফল হয়।

দেড় বছর পর ওই একই পরিবার যোদ্ধাদের ধন্যবাদ জানায় ওই সময় বিয়েটা আটকে দেওয়ার জন্য। তারা বলে তাদের পরিবারের অন্য একটি মেয়েকে ১৬ বছর বয়সে বিয়ে দিয়ে খুব খারাপ ফলাফল হয়েছে। বিয়ের পরে পরেই মেয়েটি গর্ভবতী হয় এবং একটি মৃত সন্তানের জন্ম দেয়। এর সামান্য কিছুদিন পরেই সে আবার গর্ভবতী হয় এবং খুব কম ওজনের সাংঘাতিক অপুষ্টিতে ভোগা একটি শিশুর জন্ম দেয়।

'এটি মাত্র একটি উদাহরণ', বলে সাহানারা। 'আরো অনেক পরিবার তাদের মেয়েদের খুব কম বয়সে বিয়ে দিয়ে পস্তাচ্ছে, তারা বুঝেছে এতে আরো অনেক সমস্যাকে ডেকে আনা হয়। অল্পবয়সী মায়েদের ক্ষেত্রে বিপজ্জনক গর্ভাবস্থা একটি সাধারণ সমস্যা, কারণ তাদের অনেকেরই রক্তাল্পতা থাকে। কখনো কখনো এই কেসগুলি মারাত্মক হয়ে যায়, ফলে প্রসবের সময় মৃত্যুও ঘটে', বলে সাহানারা।

শিক্ষক ও কন্যাশ্রী যোদ্ধার দ্বৈত ভূমিকায় সাহানারা এখন এলাকায় একজন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। গ্রামের স্বাস্থ্যকর্মী এবং অঙ্গনওয়াড়ী কর্মীরা তার সাহায্য চায় এবং গ্রামের জমায়েতে মেয়েদের রক্তাল্পতা কীভাবে দূর করা যায়, নিরাপদ মাতৃত্ব, ম্যালেরিয়া ও ডেঙ্গু প্রতিরোধ ইত্যাদি বিষয়ে তাকে কথা বলতে ডাকে। একজন যোদ্ধা হিসেবে সে গ্রামের পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার গুরুত্ব এবং বাল্যবিবাহের কুফল নিয়ে নিয়মিত আলোচনা করে। এইসব বিষয়কে এলাকায় মানুষ আজ গুরুত্ব দিয়ে বিচার করে সাহানারার কারণেই। 'সম্পূর্ণ কৃতিত্ব কন্যাশ্রী প্রকল্পের' বলে সাহানারা। 'ওই প্রকল্পের জন্যই আজ আমি দু-চারজন মানুষের সামনে নিজের বক্তব্য রাখতে শিখেছি'। "কন্যাশ্রী" আমাকে শুধুমাত্র সাহস এবং আত্মবিশ্বাস দেয়নি,' সাহানারা বলে, 'কন্যাশ্রী প্রকল্প আমাকে আমার পরিচয় দিয়েছে'।

কন্যাশ্রী - পরিবর্তনের

গল্প

4

রুমি খাতুন, ১৬,
দশম শ্রেণী,
শেরপুর উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল,
খড়গ্রাম, মুর্শিদাবাদ

বাল্যবিবাহের কবল থেকে বেরিয়ে আসা একটি মেয়ে

দৃঢ়সংকল্প নিয়ে রুমি তার নিজের বিয়ে দু-বার আটকে দিয়েছে

গ্রামে বেশিরভাগ বাড়ি যেখানে ইঁটের তৈরী, সেখানে রুমি খাতুনের পরিবার খড়, মাটি দিয়ে তৈরী বাড়িতে থাকে। নয় সন্তানের মধ্যে সে সবচেয়ে ছোটো। তার পাঁচ দিদি এবং তিন দাদা সকলেই বিবাহিত। তাই তার বাবার তুতো ভাই এসে যখন বললো তার ছেলে রুমিকে বিয়ে করতে চায়, রুমির বাবার প্রথম প্রতিক্রিয়া ছিলো রুমি পড়াশোনা করছে; তাঁরা এখন তার বিয়ের কথা ভাবছেন না।

রুমি একদিন আগে যখন মায়ের সাথে বাজারে গিয়েছিলো তখন ছেলেটি তাকে দেখেছিলো। সে তাদের অনুসরণ করে রুমির বাড়িতে আসে। আত্মীয় হবার কারণে রুমির পরিবার তাকে আগে থেকেই চিনতো। তারা ছেলেটির ওপর বেশ খুশিই হয় কারণ তার রোজগার ভালো। পরেরদিন সেই ছেলেটির বাবা বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসে এবং কনের মূল্য হিসেবে সোনার গয়নাও দেবে বলে। লোকটি যে'কথা তখন বলে না, তা হলো ছেলেটির ইতিমধ্যেই দুটি বউ রয়েছে।

রুমি প্রতিবাদ করলেও তার দাদা বাবাকে চাপ দিতে থাকলো। সে রুমিকে বোঝায় যে বিয়ে ব্যাপারটা ততটা খারাপ নয়, কারণ সে নিজেও বেশ কিছু বছর ধরে বিবাহিত। কিন্তু রুমি নিজের সিদ্ধান্তে অটল ছিলো। সে অন্ততঃ স্কুলের পড়া শেষ করার আগে বিয়ে করতে চাইছিলো না।

পরদিন স্কুলে সে তার প্রিয় বন্ধুদের সাথে কথা বলে এবং তারা সকলে মিলে এই বিষয়টি নিয়ে কন্যাশ্রী নোডাল শিক্ষক ও প্রিন্সিপালের সাথে কথা বলে। তার স্কুল যখন বি ডি ও অফিসে ফোন করে সব কথা জানায়, ব্লকের কর্মীরা পুলিশ নিয়ে রুমির বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়। 'ব্লকের কর্মীরা খুব তাড়াতাড়ি কাজ করেছিলো। তারা আধ ঘন্টার মধ্যে রুমির বাড়িতে পৌঁছে গেছিলো,' স্কুলের প্রিন্সিপাল বলেন।

রুমি নিশ্চিন্ত হলো এই ভেবে যে বিপদ আটকানো গেছে। কিন্তু বিপর্যয় কি সত্যিই থেমে গিয়েছিলো? 'তিনদিনের মাথায় আমার দাদা আর বৌদি আমার মারধর করলো এবং বললো যে এখন থেকে আমার স্কুলে যাওয়া বন্ধ কারণ সাতদিন পরে আমার বিয়ে হতে চলেছে,' রুমি জানায়। তার বৌদি তাকে এ'কথা বলে রাজি করানোর চেষ্টা করে যে এটা খুব ভালো প্রস্তাব কারণ তাকে সোনার গয়না দেওয়া হচ্ছে। সেদিন সন্ধ্যায় রুমি বি ডি ও কে ফোন করে তার বাবার ফোন থেকে।

'পরেরদিন সকাল সকাল আমি দুজন পুলিশকে ইউনিফর্ম পরে রুমির বাড়ি পাঠালাম। এবং তাঁরা এবার আর ছেড়ে কথা বলেননি। তাঁরা পরিষ্কার বোঝালেন যে বিয়ে দিলে রুমির বাবা, মা আর দাদাকে হাজতবাস করতে হবে,' খড় গ্রামের বিডিও সাহেব বলেন। তাঁর ওই দিনটার কথা পরিষ্কার মনে আছে।

এখন রুমির মা বাবা রুমিকে পড়াশোনা করাবার বিষয়ে বদ্ধপরিকর। 'কেন দেবনা পড়তে? ও তো স্কুল থেকে বই, খাতা, ড্রেস সবই পায়। তবে পড়তে দেবো না কেন?' রুমির মা রাজিয়া বিবি বলেন।

রুমি এখন নিশ্চিন্তে থাকতে পারে। মনযোগী ছাত্রী রুমি বয়সের তুলনায় ছোটোখাটো দেখতে হতে পারে, কিন্তু সে খুব প্রত্যয়ী।

এখন রুমির মা বাবা রুমিকে পড়াশোনা করাবার বিষয়ে বদ্ধপরিকর। 'কেন দেবনা পড়তে? ও তো স্কুল থেকে বই, খাতা, ড্রেস সবই পায়। তবে পড়তে দেবো না কেন?' রুমির মা রাজিয়া বিবি বলেন।

রুমি আর তার সহপাঠীরা এখন বিয়ের কথা ভাবছে না। তারা বারো ক্লাস ও তারও বেশি পড়ার ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে।

রুমি আর তার মা বাবা (ওপরে), এবং বন্ধুরা (নীচে বাঁ দিকে)

ঘটনার পর ছয় মাস কেটে গেলেও রুমি এখনো রেগে যায় এ'কথা ভেবে যে দুজন স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও একজন লোক কী করে আবার বিয়ে করতে সাহস করে। রুমির মা বাবা বলে তাদের ছেলে এই বিয়েটা দিতে চেয়েছিলো কারণ তার মতে সম্বন্ধটা খুব ভালো ছিলো। পাত্রকে তার পছন্দ ছিলো এই কারণে যে সৌদি আরবে তার আত্মীয় আছে এবং সে বছরে এক দুবার সেখানে ব্যাবসার কাজে যায়। রুমির দাদা ভেবেছিলো এ বিয়ে হলে সেও বিদেশে কাজের সুযোগ পেতে পারে। রুমির মা আরো বলেন, তার পাত্র পছন্দ ছিলো কারণ তারা তাঁদের আত্মীয় আর তাঁর বিশ্বাস ছিলো এখানে বিয়ে হলে রুমি ভালো একটা বাড়ি পাবে।

বাড়িতে পুলিশ আসার পর লোকে যখন বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে শুরু করলো, তখন জানা গেলো পাত্রের আগের দুই বউ এর কথা। পাড়া প্রতিবেশি এবং আত্মীয়দের মাধ্যমে পাত্রের সমস্ত কথা জানাজানি হয়ে গেলো।

পাড়ার কিশোরীরা এই ভেবে খুশী হলো যে রুমি একটা খারাপ বিয়ের হাত থেকে বেঁচে গেলো। এরা রুমির সাথে স্কুলে যায়। এই কিশোরীরা এই মুহূর্তে বিয়ের কথা ভাবছে না। তারা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে ক্লাস ১২ শেষ করা এবং ১৮ বছর বয়স হলে কন্যাশ্রী প্রকল্পের ২৫,০০০ টাকার জন্য আবেদন করার ওপর। তারা বলছে তারা এই টাকা পরে আরো বেশি পড়ার সময় কাজে লাগাবে।

বিয়ের কথা রুমিরও পরিকল্পনায় নেই। 'বিয়ে সঠিক সময় হ'লেই হবে। আগে আমি নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাই' রুমি বলে। গলার স্বরে স্থির সকল্প নিয়ে রুমি বলে 'রোজগার সম্মান আনে।'

5

রুবাইয়া পরভিন, ১৮, গ্রামে মেয়েদের দলের নেত্রী, পশ্চিম কালাবারি ঘাট অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র, সুটকাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত, কুচবিহার ১ ব্লক, কুচবিহার

কন্যাশ্রী প্রকল্পের একজন প্রতিনিধি

বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে তার সংগ্রাম, সে আর্থিক স্ব-নির্ভরতাও অর্জন করতে চলেছে

রুবাইয়া পরভিন কন্যাশ্রীর প্রথম সারির মুখ। দর্শনে বি এ দ্বিতীয় বর্ষ অনার্স পাঠরত এই ছাত্রী তার কান্ট ও দেকার্তে সম্পর্কে ধারণা দিয়ে মানুষের মন জয় করতে পারবে। ডিগ্রী কোর্সে পড়ার পাশাপাশি রুবাইয়া ই-লার্নিং/ ই-কমার্স ও সফট স্কিল নিয়ে প্রশিক্ষকের ইন্টার্নশিপ করছে যার জন্য তাকে অন্য শহর বা পাশের জেলায় যেতে হয়। প্রশিক্ষক হয়ে যাবার পর সে ১০,০০০ টাকা রোজগার করতে পারবে বলে জানায়। কোর্সে ভর্তি হবার জন্য সে 'কন্যাশ্রী প্রকল্প' থেকে পাওয়া ২৫,০০০ টাকা কাজে লাগিয়েছে।

আর্থিক স্ব-নির্ভরতার পথে এগোনোর সাথে সাথে, রুবাইয়া বাল্যবিবাহ বন্ধ করার ক্ষেত্রে একজন যোদ্ধা হিসাবে পরিচিত। তার পরিচয় তাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। অজানা নম্বর থেকে, যেসব মেয়েদের সে চেনেনা তাদের থেকে সে টেক্সট মেসেজ পায়, কোনো বিয়ে রোখার জন্য, এমনকী পঞ্চায়েতের সদস্যরা তাঁদের নিজেদের বাড়ির অবৈধ বিয়ে বন্ধ করতে তার সাহায্য চায়, যাতে তাঁদের নিজেদের, আত্মীয়দের সঙ্গে বিতর্কে না জড়াতে হয়।

রুবাইয়া ও তার সঙ্গীসাথীরা গ্রামবাসীদের সাথে সভা পরিচালনা করছে।

অঙ্গনওয়াড়ী কর্মীদের সাথে রুবাইয়া।

রুবাইয়া ১৩ বছর বয়সে কন্যাশ্রী প্রকল্পে নাম লেখানো এবং গ্রামে অঙ্গনওয়াড়ীর মেয়েদের দলে যোগ দেবার পর থেকেই বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে লড়ছে। ওই দলে বর্তমানে ৭৫ জন সদস্য; সকলেই কন্যাশ্রী। এই দলের সক্রিয়তায় তাদের গ্রামে সব মেয়েই এখন স্কুলে পড়ে।

এই দল প্রতি বছর একজন নেত্রী (সখী) এবং তার সহকারী (সহেলি) নির্বাচন করে। রুবাইয়া পরপর দুবার সখী নির্বাচিত হয়েছে। সে এবং তার সহেলি জীবনশৈলী শিক্ষা, পুষ্টি-স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং কিশোরীদের প্রজনগত ও যৌন স্বাস্থ্য নিয়ে দু-দিনের প্রশিক্ষণে যোগ দিয়েছে। এই প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হলো সখী ও সহেলিকে নিজের দলকে প্রশিক্ষিত করার কাজে লাগানো এবং তাদের গ্রামে অঙ্গনওয়াড়ী কর্মীদের তত্বাবধানে কাজ করা।

হাতে আঁকা গ্রামের একটি ম্যাপ দেখিয়ে রুবাইয়া বলে, এটি ব্যবহার করে তাদের দল অপুষ্টিতে ভোগা ও স্কুলছুট মেয়েদের খুঁজে বার করে। তারা নিয়মিত দলের সদস্যদের উচ্চতা ও ওজন মাপে এবং বডি মাস ইন্ডেক্স(বি এম আই) হিসাব করে। অতি পরিচিত কিছু ঋতুকালীন সমস্যায় দলনেতা হিসেবে রুবাইয়া ও অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী কিশোরীদের এলাকায় তাদের যাওয়ার উপযুক্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রথাগতভাবে রেফার করার ক্ষমতা রাখে।

অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী ও রুবাইয়া মাঝে মাঝে খেলায় খেলায় শেখার আয়োজন করে থাকে যেগুলিতে কিশোরীদের খেলার মাধ্যমে কিছু জিনিস শেখানো হয়। খেলায় খেলায় শেখায় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মজার ছলে কিছু শেখানো হয়। প্রতিটি সভায় আলাদা আলাদা বিষয় নিয়ে আলোচনা হলেও এগুলো একটি অন্যটির ওপর ভিত্তি করে তৈরী। প্রথমদিকের সভাগুলি তথাকথিত কিছু 'নিরাপদ' বিষয়ের ওপর। যেমন, পুষ্টি বা হাত ধোওয়া। যেগুলির মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের আত্মবিশ্বাস বা একে অন্যের ওপর বিশ্বাস গড়ে ওঠে। যখন তাদের মধ্যে অনেকটা সহজ সম্পর্ক গড়ে ওঠে, এবং তারা সভাগুলি উপভোগ করতে শুরু করে, তখন প্রশিক্ষক অংশগ্রহণকারীদের আরো 'স্পর্শকাতর' বিষয় আলোচনার দিকে নিয়ে যান যেমন, প্রজননগত স্বাস্থ্য, সাধারণ পরিবার পরিকল্পনা এবং এইচ আই ভি/এডস।

এই অনুষ্ঠানে মেয়েরা বাল্যবিবাহের সচেতনতার ওপর একটি নাটকে অভিনয় করে। আধিকারিকরা তাদের সম্মাননা প্রদান করেন কারণ তারা সেই বছর ১১ টি বাল্যবিবাহ রুখতে পেরেছিলো।

রুবাইয়া আর তার দলের সদস্যরা গ্রামের পুরুষ ও মহিলাদের সাথে একটি কমিউনিটি ফোরাম গড়ে তুলেছে। একটি স্থানীয় এন জি ও এই ফোরাম গড়তে উদ্যোগ নিচ্ছে। এই ফোরাম এখনো প্রাথমিক স্তরে। মেয়েদের দল চেষ্টা করে মাসে একবার সভার আয়োজন করতে, যাতে গ্রামের মানুষদের নানা বিষয় নিয়ে কথা বলা হয়। এই সভায় তারা অন্যান্য বিষয়ের সাথে নিজেদের অধিকার, জমির মালিকানা নিয়ে নানা বিষয়, ব্যাংকিং, গরিবদের জন্য গৃহ যোজনা, নির্মল বাংলা অভিযানে শৌচাগার প্রকল্প নিয়ে কথা বলে। সাহায্যের জন্য এই সভাগুলিতে অঙ্গনওয়ারী কর্মী উপস্থিত থাকেন।

দেখা যাচ্ছে, রুবাইয়া একজন নেত্রী হিসাবে উঠে আসছে। এই সভায় যারা যারা আসেন, তাদের বয়স তার থেকে অনেক বেশি। কিন্তু তারা রুবাইয়ার কথা মন দিয়ে শোনেন। তারা তাকে সম্মান করেন, কারণ সে শিক্ষিত এবং তার হাতে কর্তৃত্ব আছে। সব বাধা কাটিয়ে নিজের আরো ভালো থাকার তাগিদে আত্মবিশ্বাস এবং মানসিক শক্তির কারণে সে গ্রামে অন্যদের চেয়ে আলাদা। আলোচনার বিষয়গুলি রুবাইয়া শুধু জানে তাই নয়, সে খুব ভালো বক্তা, যা সে আরো ভালো রপ্ত করেছে ই-লার্নিং/ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানে ইন্টার্ন হিসেবে থাকার সময়।

অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র পরিচালিত মেয়েদের দলের কেন্দ্রে রয়েছে রুবাইয়া। সে সরকারের ছয় বছর পর্যন্ত বয়সী শিশুদের জন্য শিশু স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্যক্রমের উল্লেখ করে বলে, 'আমি একেবারে শিশু বয়স থেকে এখানে খিচুড়ি আর ডিম সেদ্ধ খেতে আসতাম।' পাঁচ বছর ধরে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে রুবাইয়া এখন অভিজ্ঞ। পথে তাকে অনেক বাধাও পার করতে হয়েছে। 'আমাদের মুসলিম সমাজে বাল্যবিবাহ রোধ করা অনেক বেশি কঠিন। কয়েকঘন্টার মধ্যে একটি বিবাহ আয়োজন করা যেতে পারে। আমরা কিছু জানতে পারার আগেই একটা নাবালিকা কন্যার বিয়ে হয়ে যেতে পারে,' রুবাইয়া বলে। কয়েক মাস আগে ঠিক এমনই হয়েছিলো। বাধা আসতে পারে জেনে একটি অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ের বিয়ে দেবার জন্য পাত্রপক্ষকে মাঝরাতে আসতে বলা হয়। তাদেরকে বিয়ে করাবেন যিনি সেই কাজিকেও নিয়ে আসতে বলা হয়।

রুবাইয়া এই মাঝরাতে বিয়ের কথা জানতে পেরে যথারীতি চাইল্ডলাইন (1098 - বাচ্চাদের জন্য সরকারী হেল্পলাইন)-কে

জানায়। চাইল্ডলাইন দল সেই বাড়িতে পৌঁছোনোর পর বাড়ির লোক জানায় সেখানে কোনো বিয়ে হচ্ছে না। "চাইল্ডলাইনের সবাই তখন আমার ওপর নারাজ। আমি অযথা, ভুল খবরের ভিত্তিতে, ওঁদের মধ্যরাতে টেনে আনিয়েছি,' রুবাইয়া বলে। রুবাইয়া আন্দাজে চাইল্ডলাইন দলকে আবার একবার পরিস্থিতি দেখতে বলে। দল এবার অবাক হয়ে দেখে বিয়ের সব ব্যবস্থা পাকা এমনকী কাজিও উপস্থিত। তারা এই বাল্যবিবাহকে রুখতে একেবারে সঠিক সময়ে উপস্থিত হয়েছেন।

রুবাইয়া আর তার দল বাল্যবিবাহ রুখতে কয়েক বছর ধরে কাজ করলেও সমাজ তাদের তেমনভাবে গুরুত্ব দেয়নি কয়েকমাস আগে পর্যন্তও। এলাকার মানুষের ধ্যানধারণা বদলে যায় যখন মেয়েদের দলের শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০১৯ পালন অনুষ্ঠানে ব্লকের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও আধিকারিকরা উপস্থিত হন। এই অনুষ্ঠানে মেয়েরা বাল্যবিবাহের সচেতনতার ওপর একটি নাটকে অভিনয় করে। আধিকারিকরা তাদের সম্মাননা প্রদান করেন কারণ তারা সেই বছর ১১ টি বাল্যবিবাহ রুখতে পেরেছিলো। সরকারি আধিকারিকদের গ্রামের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার ঘটনা মেয়েদের দলের প্রতি গ্রামের সম্মান বাড়ালো। এরপর থেকে গ্রামে তাদের পদমর্যাদা রাতারাতি বেড়ে গেলো ও এভাবেই তারা কাজ করে চলেছে।

6

পঞ্চমী মল্লিক, ১৬, একাদশ শ্রেণী
কালজানি শাহজানুদ্দিন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কোচবিহার ২ ব্লক, কোচবিহার

একদা ঘটনার বলি এখন পরিবর্তন আনছে

এক সময় জোর করে যার বিয়ে দেওয়া হচ্ছিল, সেই মেয়েটি এখন বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছে

‘আমাদের বিদ্যালয়ের কোনও মেয়েই এখন বিবাহিতা নয়,’ গর্বের সাথে ঘোষণা করলেন স্কুলের কন্যাশ্রী নোডাল শিক্ষক। তিনি বলেন তিনি যখন ২০০৫ সালে প্রথম আসেন বছরে অন্ততঃ ২৫ টি করে মেয়ের বিয়ে হয়ে যেতো। বর্তমানে এই কো-এড স্কুলের আগের ছাত্রীরা পুলিশ কনস্টেবল, নার্স, প্রাথমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষিকার কাজ করছে। সময় পালটে গেছে। “কন্যাশ্রী প্রকল্প” সবকিছু বদলে দিয়েছে।

কন্যাশ্রী নোডাল শিক্ষক এমন একজনের কথা বললেন, যার সাথে সম্প্রতি তাঁর দেখা হয়েছিলো। শিলিগুড়ির কাছাকাছি এলাকার একজন পুলিশ কনস্টেবল সে। সে যখন দশম শ্রেণীতে পড়তো, তার স্কুলের কন্যাশ্রী দল তার বিয়ে আটকেছিলো। এই প্রাক্তন ছাত্রী তাঁকে প্রণাম করে বলে ‘স্যার, আপনি কম বয়সে আমার বিয়ে আটকেছিলেন, তাই আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। বিয়ে না আটকালে আমি এই জায়গায় কোনোদিন আসতাম না।‘ একটি স্কুলের কন্যাশ্রী দল গড়ে ওঠে নোডাল শিক্ষকের নেতৃত্বে এবং দলে থাকে অন্য দু-একজন শিক্ষক এবং উঁচু ক্লাসে পড়া কিছু কন্যাশ্রী। প্রথমে, তারা পরিবারের সাথে কথা বলে বাল্যবিবাহ আটকাবার চেষ্টা করে। যদি পরিবারটি তার পরেও কথা না শোনে, তখন দল বাল্যবিবাহ রুখতে বি ডি ও-র সাহায্য চায়।

দু-বছর আগে পঞ্চমী মল্লিকের যখন ১৫ বছর বয়স ছিলো, তখন তার বিয়ে হয়ে যাচ্ছিলো। সৌভাগ্যবশতঃ, সে এখনো অবিবাহিতা আর পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছে, স্কুলের কন্যাশ্রী দলের কারণে। শুধু তাই নয়, সে অন্য বাচ্চা মেয়েদের বিয়েও বন্ধ করছে। সম্প্রতি এ'রকম একটি ঘটনায় সে মেয়েটির সাথে কথা বলেছে এবং তার মা বাবার সাথে বাদানুবাদ করেছে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে।

পঞ্চমীর মুখে শোনা যাক তার নিজের অভিজ্ঞতা: 'সালটি ছিল ২০১৮। আমি তখন নবম শ্রেণীর ছাত্রী। আমার মা-বাবা আমার বিয়ে পাকা করে ফেলেন। আমার বিয়ে করার একদমই ইচ্ছে ছিল না। আমার ইচ্ছে আমি স্কুলে পড়ব, বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটাবো। কে না চায় সেটা? কিন্তু পরের মাসেই আমার বিয়ে হওয়ার কথা। ইতিমধ্যে পাড়ার মেয়েদের মারফত স্কুল আমার বিয়ের ব্যাপারে জানতে পারে।'

'শোনামাত্র স্কুলের কন্যাশ্রী দল আমাদের বাড়ি এসেছিলো। তাঁরা বসবার ঘরে আমার মা-বাবার সঙ্গে কথা বলছিলেন। আমি পাশের একটা ঘর থেকে তাঁদের কথা শুনছিলাম। প্রথমে ওঁরা বোঝালেন কম বয়েসে বিয়ে হলে শারীরিক কী কী সমস্যা হতে পারে একটা মেয়ের। এবং অবৈধ হওয়ার কারণে অভিভাবকদের হাজতবাস করতে হতে পারে। এছাড়া ওঁরা বিস্তারিতভাবে কন্যাশ্রী প্রকল্পের সুযোগ সুবিধের সম্বন্ধেও বললেন, যেমন ১৮ বছর বয়েসের পর ২৫,০০০ টাকার এককালীন অনুদান পাওয়া যাবে যদি মেয়েটি অবিবাহিত থাকে এবং পড়াশোনা চালিয়ে যায়। অবশেষে ওঁরা আমার মা-বাবাকে বোঝালেন যে আমার ভবিষ্যতে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর সুযোগটা তাঁরা আমার থেকে কেড়ে নিচ্ছেন। আমার মা-বাবা তখন স্বীকার করলেন ব্যাপারটা যে এতো বিপজ্জনক সেটা তাঁরা ভেবে দেখেননি। এবং কথা দিলেন আমার বিয়ে তাঁরা আইনসম্মতভাবে, উচিত বয়স হলেই দেবেন।'

'আমার ভাগ্য ভাল যে আমার স্কুল এসে আমার অসময় বিয়েটা আটকেছিলো। আমার খুব ইচ্ছে আমি অনেক পড়াশোনা করে কলেজের লেকচারার হই। তারপর সময় মতন একদিন বিয়ের কথা ভাবা যাবে।'

'আমার ভাগ্য ভাল যে আমার স্কুল এসে আমার অসময় বিয়েটা আটকেছিলো। আমার খুব ইচ্ছে আমি অনেক পড়াশোনা করে কলেজের লেকচারার হই। তারপর সময় মতন একদিন বিয়ের কথা ভাবা যাবে।'

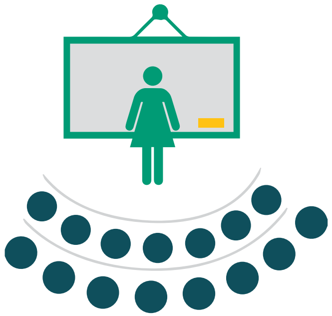

স্কুলের কন্যাশ্রী দলের সাথে পঞ্চমী মল্লিক

7

ঊষসী কন্যাশ্রী ক্লাব
নীলকুঠি সিস্টার নিবেদিতা উচ্চমাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, এস এন রোড, কোচবিহার সিটি, কোচবিহার

কন্যাশ্রী ক্লাব গরীবদের পোশাক বিলি করার কাজ করে

তারা নিজেদের বাড়ির ব্যবহৃত পোশাক সংগ্রহ করা দিয়ে পোশাক ব্যাঙ্ক শুরু করে। এখন স্কুলে গিয়ে গরীব মানুষরা ব্যবহারের যোগ্য করে তোলা সেই পোশাক নিয়ে আসেন ও ব্যবহার করেন।

তারা নিজেদের ঊষসী কন্যাশ্রী ক্লাব বলে। সদস্যরা পোশাক ব্যাঙ্ক চালায় – তারা পরার যোগ্য পুরোনো জামাকাপড় সংগ্রহ করে, সেগুলো পরিষ্কার করে প্রায় নতুনের মতো করে তোলে এবং সেগুলো ভীষণ দরিদ্র মানুষদের মধ্যে বিতরণ করে।

পোশাক ব্যাঙ্ক এর ভাবনা তাদের এসেছিলো গত শীতে। মেয়েরা বলেছিলো স্কুলে যাওয়ার সময় তারা প্রতিদিন ভোরে অনেক বাচ্চা দেখতে পেতো যাদের গায়ে উপযুক্ত পোশাক নেই, সোয়েটার নেই, পায়ে মোজা নেই। ছোটো ছোটো বাচ্চাগুলো কোচবিহারের ঠান্ডায় কাঁপতে থাকতো। মেয়েরা স্কুলে এই নিয়ে কথা বলে। তারা শিক্ষকদের সাথে কথা বলে আর এভাবেই পোশাক ব্যাঙ্কের ধারণা বাস্তবে রূপ পায়।

প্রথম প্রথম মেয়েরা বাড়ি থেকে পোশাক সংগ্রহ করা শুরু করে। শিক্ষক শিক্ষিকারাও পোশাক দেওয়া শুরু করেন। বিষয়টি সকলে

বাল্যবিবাহ বন্ধের জন্য নিবেদিতপ্রাণ প্রচারক

জবা দাস উষসী কন্যাশ্রী ক্লাবের একজন সক্রিয় সদস্যা যে নিজেকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করতে পারে। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের বিরুদ্ধে প্রচারে সে কখনো হাল ছাড়েনি। বার্তাটি সকলের কাছে পৌঁছবার কোনো সুযোগ সে ছাড়ে না।

দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রী জবা তার উষসী কন্যাশ্রী ক্লাবের অন্য মেয়েদের নিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে পরিবারগুলির সাথে কথা বলে, তাদের বোঝায় কেনো তাদের ১৮ বছর বয়সের পরে মেয়ের বিয়ে দেওয়া উচিত। সরকার কন্যাশ্রীর মাধ্যমে পরবর্তী পড়াশোনার জন্য যে এককালীন টাকা দেন তা মানুষকে মনে করাবার সুযোগ সে কখনো ছাড়ে না। সে এইসব সময়ে ছেলেদের সাথেও কথা বলে যাতে তারা নাবালিকা মেয়েদের বিয়ে না করে।

২০১৯ সাল এই স্কুলের জন্য একটি গর্বের বছর। জবা দাস বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে প্রচারে তার প্রচেষ্টার জন্য বীরাঙ্গনা পুরষ্কার নামক একটি তাৎপর্যপূর্ণ পুরষ্কার পায় ঐ বছর। পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশন বাল্যবিবাহ রুখতে মেয়েদের জন্য বীরাঙ্গনা এবং ছেলেদের জন্য বীরপুরুষ পুরষ্কার দেয় শিশু অধিকারের সুরক্ষার প্রচেষ্টার জন্য।

কন্যাশ্রী ক্লাবের হাতে তৈরী গয়না (ওপরে), বিলি করার জন্য রাখা কাচা কাপড় (নীচে)

যখন মেয়েরা কাউকে পোশাক দেয়, তারা সংগে একটা করে ছোটো চকলেট ও দেয়। এতে প্রাপকদের মুখে সবসময় একটা হাসি ফুটে ওঠে।

জানতে শুরু করার পর আত্মীয় স্বজন এবং প্রতিবেশিরাও স্কুলে পোশাক দেওয়া শুরু করেন। স্কুল থেকে এরপর খবরের কাগজে পুরোনো পোশাক চেয়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। এই বিজ্ঞাপনের জন্য যাদের পোশাকের প্রয়োজন তারা স্কুল থেকে পোশাক নিতে আসেন। ক্লাব এরপর প্রতি শনিবার স্কুলে পোশাক বিতরণ করা হয় বলে স্কুলের গেটে নোটিশ দেয়। ফলে স্কুলের গেটে এখন পোশাক দেওয়া ও নেওয়ার লোকের নিয়মিত আনাগোনা দেখতে পাওয়া যায়।

যখন মেয়েরা কাউকে পোশাক দেয়, তারা সংগে একটা করে ছোটো চকলেট ও দেয়। এতে প্রাপকদের মুখে সবসময় একটা হাসি ফুটে ওঠে।

সকলের দান করা পোশাকগুলিকে আবার ব্যবহারের যোগ্য করে তোলা হলেও একটা নতুন পোশাকের আবেদন থাকে তাতে। ক্লাবের সদস্যরা বিতরণের আগে কঠিন পরিশ্রম করে পোশাকগুলো কেচে, ইস্ত্রি করে যাতে সেগুলো নতুনের মতো দেখায়। ডিটারজেন্ট ও সাবানের খরচ তোলার জন্য তারা কস্টিউম জুয়েলারি তৈরী করে জেলা প্রশাসন আয়োজিত বিভিন্ন মেলায় বিক্রি করে।

৪ ঋতুকালীন স্বাস্থ্যবিধির বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি

আয়েষা সুলতানা চায় স্কুলের প্রতিটি মেয়ে যেনো সংক্রমণ থেকে দূরে থাকতে পারে।

আয়েষা তার স্কুলে ঋতুকালীন স্বাস্থ্যবিধির প্রচারক। সহপাঠীদের মধ্যে এই বিষয়ে প্রচার করার কাজে তাকে নিযুক্ত করেছেন স্কুলের কন্যাশ্রী নোডাল শিক্ষক। আয়েষা খুব ভালো বক্তা তাই শিক্ষক তাকে এ কাজে নিয়োগ করেছেন।

আয়েষা মেয়েদের সাথে স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহারের উপকারিতা নিয়ে কথা বলে। সে বলে যে এটি সস্তা এবং অনায়াসেই স্কুলের ভেন্ডিং মেশিন থেকে পাওয়া যায়। ‘মেয়েরা কাপড় ব্যবহার করলেও কী করে স্বাস্থ্যবিধি রক্ষা করে চলবে ও সংক্রমণ মুক্ত থাকবে তা নিয়েও আমি তাদের সাথে কথা বলি,’ আয়েষা বলে।

আয়েষার এ’কথা ভেবে গর্ব হয় যে তার স্কুলে শৌচাগারের সামনে স্যানিটারি ন্যাপকিন ভেন্ডিং মেশিন আছে। বেশিরভাগ মেয়েই এর ব্যবহার জানে, তবে স্কুলের কর্মীরা মেয়েদের ন্যাপকিনের প্রয়োজন হলে তাদের এ কাজে সাহায্য করে।

আয়েষা ছবি আঁকতেও ভালোবাসে। সে বঙ্গীয় সঙ্গীত পরিষদ অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস থেকে আঁকার ওপর ফোর্থ ইয়ার কমপ্লিট করেছে।

আয়েষা কলকাতার সরকারী আর্ট কলেজেও পড়ার স্বপ্ন দেখে। সে জীবন বিজ্ঞান ভালোবাসে। সে জুলজিতে অনার্স করে, পি এইচ ডি করে অধ্যাপিকা হতে চায়। ভবিষ্যতের এই দুটি স্বপ্ন সে দেখে।

আয়েষা দেখেছে ঋতুকালীন স্বাস্থ্যবিধির প্রচারের কারণে অনেক বেশি মেয়েরা এখন স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহার করছে। অনেকে প্রথম দু-দিন ন্যাপকিন ব্যবহার করে, বাকী কম স্রাবের দিনগুলোতে কাপড় ব্যবহার করে।

স্কুলের মেয়েরা ঋতুকালীন স্বাস্থ্যবিধি নিয়ে মাসে একবার আলোচনা করে। স্কুলের জীবন বিজ্ঞানের শিক্ষিকা আলোচনা পরিচালনা করেন; তিনি ঋতুচক্র ও তার নানা দিকের বিষয়ে ভিডিও দেখান। আয়েষা সেসব মেয়েদের নাম লিখে রাখে যারা এই সভায় যোগ দিতে পারেনি। পরে সে তাদের আলোচনার বিষয়গুলি জানিয়ে দেয়।

ঋতুকালীন স্বাস্থ্যবিধি নিয়ে আয়েষার মা তাকে প্রথম বোঝান। মা ও শিক্ষিকার উৎসাহে আয়েষা এমন একটি স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে একটি সরকারী অনুষ্ঠানে হল ভর্তি মানুষের সামনে ঋতুকালীন স্বাস্থ্যবিধি নিয়ে বক্তব্য রাখে, যেখানে পুরুষ মহিলা নির্বিশেষে অনেক কিশোরী মেয়েরাও উপস্থিত ছিলো।

9

রিবিনা টোপ্পো, ১৮, দশম শ্রেণী
আনন্দ বিদ্যাপীঠ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, ডাক বাংলো নীচ কলোনি, মালবাজার মিউনিসিপাল এলাকা, জলপাইগুড়ি

ছোটো বাচ্চাদের অবহেলা থেকে উদ্ধার করে

অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে ছোটো বাচ্চাদের পুণর্বাসন দিয়ে রিবিনা তাদের আরো ভালো ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করে

রিবিনা টোপ্পো একজন অনাথ মেয়ে। জলপাইগুড়ির আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে সে তার কাকার পরিবারে বড়ো হয়েছে। তার কাকা কাকীমা এলাকার অন্য অনেকের মতোই চা বাগানে কাজ করেন। অনেক পরিবারেই মা বাবা দুজনেই কাজে যান, এবং তাদের ছোটো বাচ্চাদের দেখার কেউ থাকে না কারণ বড়ো ভাই বা বোন থাকলে তারা হয় স্কুল নয় কাজে থাকে।

রিবিনা দেখতো ছোটো বাচ্চারা এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে, সে তাদের নিয়ে এলাকার অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে যেতে শুরু করলো। অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র সরকার পরিচালিত সামাজিক কেন্দ্র যেখানে ছয় বছরের নীচে সব বাচ্চাদের সকালবেলায় দেখাশোনা করা হয়, পুষ্টিকর খাবার খেতে দেওয়া হয় এবং প্রস্তাবিত সিলেবাস অনুযায়ী একেবারে ছোটোদের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হয়।

এখন অবধি রিবিনা তার গ্রামের ছ'জন বাচ্চাকে অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে নথিভুক্ত করিয়েছে। অঙ্গনওয়াড়ী কর্মীদের সাহায্যে সে বাচ্চাদের

বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের মা বাবাকে বুঝিয়েছে এই কেন্দ্রে যোগ দিলে তাদের বাচ্চারা ভালোমতো যত্ন পাবে, তাও বিনামূল্যে। রিবিনা নিজে ছয় বছর বয়স পর্যন্ত প্রতিদিন এই কেন্দ্রে যেতো এবং তার খুব সুন্দর স্মৃতি আছে সেখানকার। সে বাচ্চাদের মা বাবাকে রাজি করিয়েছে কাজে যাবার আগে কেন্দ্রে তাদের ছোটো বাচ্চাদের দিয়ে যাওয়ার জন্য।

রিবিনার গরম খাবার আর খেলনাগুলোর কথা পরিষ্কার মনে আছে। 'আমার সেই দিদির কথা মনে আছে যিনি আমাদের নানা শিক্ষামূলক খেলা খেলাতেন; আমি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে সংখ্যা ও ABC শিখেছি' সে বলে। 'আমি বাচ্চাদের মা-বাবাকে বোঝাই যে সরকার যেখানে আপনার বাচ্চার জন্য এতো সুবিধে দিচ্ছে আপনারা কেন নিজের সন্তানকে কাজে যাওয়ার আগে কেন্দ্রে ছেড়ে আসতে পারবেন না? এতে ওদেরই ভবিষ্যৎটা উজ্জ্বল হবে,' রিবিনা বলে।

সে খুব ভালো করে বুঝতে পারে একটি বাচ্চা পরে স্কুলে কেনো খারাপ করে। অঙ্গনওয়াড়ী প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা কার্যক্রমগুলি বাচ্চাদের প্রাথমিক স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে পড়ার উপযুক্ত করে তৈরী করে দেয়। এই পর্বের শিক্ষাটি না পেলে তাদের মধ্যে চিরকালের জন্য একটা খামতি থেকে যায়। 'আমি এরকম অনেককে চিনি। আমার ক্লাসেও এরকম অনেকেই আছে যারা ভালোভাবে পড়তে বা লিখতে পারেনা। অঙ্গনওয়াড়ীর শিক্ষা বাদ পড়ে গেলে একটা বাচ্চা প্রতিবন্ধী হয়ে স্কুল জীবন শুরু করে,' রিবিনা বলে।

রিবিনা তার স্কুলে কন্যাশ্রী ক্লাবের সদস্য। সে বলে ক্লাবের কাজকর্ম তাকে সমাজের কথা ভাবতে শেখায়। এগুলো তাকে তার এলাকায় ছোটো বাচ্চাদের সাহায্যের জন্য কাজ করতে উৎসাহ জোগায়। 'আমি যেখানে থাকি সেখানে বাল্য বিবাহ হতে দেখিনি। কিন্তু কন্যাশ্রী হওয়ার পর বুঝতে পারলাম যে স্কুল ড্রপআউট একটা বড় সমস্যা আমাদের সমাজে। এবং আমি দেখলাম যে এখানে আমি কিছু করতে পারি। আমি শিশুদের অবহেলা থেকে রক্ষা করতে পারি,' মৃদু হাসি হেসে রিবিনা বলে।

রিবিনা দেখতো ছোটো বাচ্চারা এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে, সে তাদের নিয়ে এলাকার অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে যেতে শুরু করলো।

স্কুলের শিক্ষকদের সাথে রিবিনা

10

রেশমা পরভিন, ২০,
গ্রাম ঘাসমারি বস্তি
নাগরাকাটা, উন্মুক্ত মলত্যাগ
মুক্ত (ODF) ব্লক, জলপাইগুড়ি

তার ব্লক তার জন্য গর্বিত

নিজের পরিবারের জন্য শৌচাগার তৈরীর চেষ্টা নাগরাকাটার ও ডি এফ হওয়ার মূলে রয়েছে

কন্যাশ্রী প্রকল্প থেকে ২৫,০০০ টাকা পাওয়ার এক বছরের মধ্যে রেশমা পরভিন তার বাড়িতে শৌচাগার তৈরী করে।

কন্যাশ্রীতে পাওয়া টাকা দিয়ে সে কীভাবে ২০১৮ তে তার পরিবারের জন্য শৌচাগার বানাবে বলে স্থির করে বলতে গিয়ে রেশমা বলে, 'মলত্যাগের জন্য মাঠে যেতে ভাল লাগতো না। এটা অত্যন্ত লজ্জার ব্যাপার।' কয়েক মাস আগে আমার পরিবারের পাকা বাড়ি হয়েছে। সরকারের হাউজিং প্রকল্পের সাহায্যে তারা বাড়ি করেছে। 'কিন্তু ঘরগুলি তৈরী করতে গিয়েই সব টাকা খরচ হয়ে গেলো। শৌচাগারের জন্য কিছু আর বাঁচেনি,' জানান রেশমার বাবা।

রেশমার মা জহুরা বেগম এটাকে প্রাধান্যের বিষয় বলে মনে করেন। 'একজন পুরুষ মানুষ শৌচাগারের অতটা প্রয়োজন বোধ করেন না। আমরা মহিলারাই এটার দরকার বোধ করি বেশি। কারণ এটা আমাদের লাজ শরমের বিষয়ও,' তিনি যোগ করেন। তাই রেশমা যখন কন্যাশ্রীর অনুদানের টাকা দিয়ে শৌচাগার বানাতে চায় তখন তার মা সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে যান।

রেশমার খুব অস্বস্তি হয়, হিংসেও, কারণ তার কাকীমা ও খুড়তুতো বোন পাকা শৌচাগার ব্যবহার করতো আর সে খোলা জায়গায় মলত্যাগ করতে যেতো।

অন্যান্য বিষয়ও রয়েছে, রেশমার পরিবারের সাথে একই উঠোনে থাকে তার ঠাকুরদা ঠাকুমা ও কাকার পরিবার। তাদের ঘরের সাথে সাথে পাকা শৌচাগার রয়েছে। সরকারের নিরাপদ স্বাস্থ্যবিধি কার্যক্রমের দ্বারা তারা শৌচাগার বানিয়েছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ রেশমার বাবা তার বাবা মায়ের পরিবার থেকে আলাদা হয়ে এসেছেন আর নিজের আলাদা বাড়ি তৈরী করেছেন, তিনি ওই কার্যক্রম থেকে শৌচাগার তৈরীর টাকা পাবেন না কারণ এতে একটি বাড়িতে একটিমাত্র শৌচাগার বানাবার অনুমোদন দেওয়া হয়। রেশমার খুব অস্বস্তি হয়, হিংসেও, কারণ তার কাকীমা ও খুড়তুতো বোন পাকা শৌচাগার ব্যবহার করতো আর সে খোলা জায়গায় মলত্যাগ করতে যেতো।

রেশমা যে পরিবেশ বান্ধব (সবুজ) শৌচাগার বানিয়েছিলো তাতে তার পরিবারের চাষের কাজেও সাহায্য হচ্ছিলো। শৌচাগারে টুইন লিচ পিট প্রযুক্তির ব্যবহার হয়েছিলো, যা মলকে সার-এ পরিণত করে। সরকার নিরাপদ স্বাস্থ্যবিধি কার্যক্রম নির্মল বাংলা অভিযানে এই কম খরচের প্রযুক্তির প্রচার করেন উন্মুক্ত মলত্যাগ মুক্ত রাজ্য তৈরী করতে।

রেশমার বাবা বলেন তিনি একবার মাত্র পিট পরিষ্কার করেছিলেন – তিনি ঐ সার দিয়ে জৈব সব্জির চাষ করেন। 'সব্জির স্বাদ অনেক ভালো হয় যখন আমরা এই সার ব্যবহার করি; এই সার মাটির জন্যও ভালো।' তিনি বলেন এবং এও বলেন যে রাসায়নিক সার কেনার জন্য যে খরচ হতো, সে টাকাটা তিনি এখন সঞ্চয় করেন।

মা ও বোনের সাথে রেশমা

এই সময়টায় তাদের ব্লক উন্মুক্ত মলত্যাগ মুক্ত হওয়ার পথে এগোচ্ছিলো। প্রায় সব পরিবারেই শৌচাগার ছিলো আর খুব কম মানুষই খোলা জায়গায় মলত্যাগ করতে যেতো। গ্রামীণ নজরদারি সমিতি গঠন করা হয়েছিলো খোলা জায়গায় মলত্যাগ বন্ধ করার জন্য। তারা খুব কঠোর নিয়ম পালন করছিলো। সকালবেলা মলত্যাগ করার জায়গাগুলোতে তারা বাঁশি বাজাতো। মোদ্দা কথা, শৌচাগার বানাবার জন্য চাপ বাড়ছিলো। এই সময় সারা দেশ উন্মুক্ত মলত্যাগ মুক্ত অবস্থান তৈরী করতে চাইছিলো; তাই প্রতি জেলা, ব্লকগুলিকেও তাদের লক্ষ্য পূরণ করতে হচ্ছিলো।

আজ ব্লক রেশমার ওপর গর্বিত। 'তাঁর সচেতনতা এবং পরিবারের জন্য শৌচাগার তৈরির প্রচেষ্টা ব্লকটিকে উন্মুক্ত মলত্যাগ মুক্ত খেতাব অর্জনে সহায়তা করেছে,' ব্লক অফিসের কন্যাশ্রী নোডাল অফিসার বলেন।

বর্তমানে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রী রেশমা আরো পড়তে চায়। সে অন্ততঃ তার ব্যাচেলর ডিগ্রী শেষ করতে চায়। কয়েক বছর আগে তার মা বাবা যখন তার জন্য বিয়ের প্রস্তাব এনেছিলেন, সে পরিষ্কার জানিয়েছিলো তার বিয়ে করার কোনো তাড়া নেই। 'আমার কাছে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পড়াশোনা শেষ করা' সে জানায়।

11 ঘরে ঘরে ডেঙ্গু প্রতিরোধ

কন্যাশ্রী ক্লাবের মেয়েরা অনেক বাড়িতে এই প্রচার করে

বর্ষার আগে স্কুলের কন্যাশ্রী মেয়েরা ডেঙ্গু প্রতিরোধ নিয়ে স্কুলের আশপাশের ৩০ টি বাড়িতে ও সেইসঙ্গে নিজেদের বাড়ি ও প্রতিবেশীদের কাছে প্রচার করে।

কন্যাশ্রী ক্লাব প্রচুর বাড়িতে ডেঙ্গু প্রতিরোধ বিষয়ে প্রচার করে। স্কুলের বেশিরভাগ মেয়ে চা বাগান এলাকার। তারা গ্রামের বস্তিতে থাকে। তাদের মা বাবা দিনমজুরের কাজ করেন।

মশার জন্মস্থান নিয়ন্ত্রণে এনে মেয়েরা ডেঙ্গু প্রতিরোধ করছে। সপ্তাহে একবার তারা দল বেঁধে কন্যাশ্রী প্রকল্পের বার্তার প্ল্যাকার্ড হাতে পথ চলে; ডেঙ্গু প্রতিরোধের প্ল্যাকার্ড এর পাশাপাশি বিয়ের বৈধ বয়স এবং মেয়েদের শিক্ষার বিষয়েও বার্তা থাকে।

প্রতি সপ্তাহে তারা স্কুলের আশপাশের পাঁচটি করে বাড়িতে যায় এবং সকলকে একত্র করে ডেঙ্গু কেনো হয় ও তা কীভাবে প্রতিরোধ করা যায় সে বিষয়ে কিছু বার্তা পড়ে শোনায়।

কীভাবে উঠোনে পড়ে থাকা নারকোলের খোলা, পুরোনো টায়ার, প্লাস্টিকের জার বা টিন-এ বৃষ্টির জল জমে যাতে মশারা এসে ডিম পাড়ে সে কথা তারা সকলকে বুঝিয়ে বলে।

তারা মানুষকে বলে এগুলো বাড়ির আশপাশ থেকে সরাতে এবং ড্রেনে ব্লিচিং পাউডার ছড়াতে, যা মশার লার্ভাদের মেরে ফেলে।

12

অঞ্জলী দাস, ২১, ব্যবসায়ী
সন্ন্যাসীকাটা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রী,
রাজগঞ্জ ব্লক, জলপাইগুড়ি

কন্যাশ্রীর অনুদানের টাকায় তার ব্যবসা শুরু হয়েছে

দোকানে অনেক বিক্রি হচ্ছে তাই অঞ্জলী তার ব্যবসা আরো বাড়াতে চাইছে

অঞ্জলী দাস তার স্কুলের মেয়েদের কাছে একজন রোল মডেল। কন্যাশ্রী প্রকল্প তার জীবনকে নতুন রূপ দিয়েছে এবং এগিয়ে নিয়ে গেছে। ২০১৮ সালের এপ্রিলে সে আর তার ভাই তার পরিবারের জমিতে একটা দোকান বানায় কিন্তু দোকান চালু করে না। ১৮ বছর বয়স হবার পর যখন অঞ্জলী তার কন্যাশ্রী অনুদানের টাকা পায় সে এই পুরো টাকা দিয়ে দোকানের জন্য জিনিসপত্র কেনে। তার ভাই একই পরিমাণ টাকা খরচ করে এবং দুজনে পার্টনারশিপে ব্যবসা শুরু করে।

দোকানটি বুদ্ধি করে স্কুলের গেটের উল্টোদিকেই তৈরী করা হয়েছিলো। ‘আমার স্বপ্ন ছিলো এখানে একটা দোকান করার কারণ এখানে আমাদের জমি ছিলো। আমি জানতাম যদি আমরা কানের দুল ও সাজগোজের জিনিস বিক্রি করি, বা মেয়েদের আকর্ষণ করে এমন জিনিস বিক্রি করি, তবে আমরা ভালো ব্যবসা করবো। মেয়েরা অনেক দূর থেকে স্কুলে আসে। উল্টোদিকেই দোকান থাকলে বেশ সুবিধা হবে,’ অঞ্জলী বলে।

ওরা লিপস্টিক, নেলপালিশ, ছোটো কানের দুল, সাজগোজের জিনিস দিয়ে শুরু করে, কিন্তু ক্রেতাদের থেকে খাতা, পেন ও অন্যান্য

স্কুলের মেয়েদের সাথে দোকানে অঞ্জলী (বাঁ-দিকে)। দোকানের তাকে থরে থরে আকর্ষণীয় জিনিসের সম্ভার দেখেই বোঝা যায় দোকানটি ভালো ব্যবসা করছে।

স্কুলের অনেকে মেয়েই এখন অঞ্জলীকে দেখে কন্যাশ্রীর অনুদানের টাকা দিয়ে ১৮ বছর বয়স হলে নিজের নিজের ব্যবসা শুরু করতে চায়।

ভাই এর সাথে অঞ্জলী (বাঁ-দিকে)

জিনিসপত্রের চাহিদা আসতে থাকে। এখন সে ব্যবসা আরো বাড়াবার কথা ভাবছে এবং দোকানের পেছনে একটি বিউটি পার্লার বানাবার পরিকল্পনা করছে। এভাবে সে একটি একটি করে পদক্ষেপ ফেলছে। সে কনে সাজাবার একটি কোর্স করেছে এবং নিজেই আলাদা করে মেক-আপ আর্টিস্ট হিসেবে কনে সাজাবার কাজ করছে। পরিপাটি বেশভূষা ও সামান্য চোখের মেক-আপে অঞ্জলী তার ব্যবসার চলন্ত বিজ্ঞাপন হয়ে উঠেছে।

'আমি যখন কন্যাশ্রীর অনুদানের টাকা পেলাম, আমি সেটাকে ভালো কাজে ব্যবহার করবো ঠিক করলাম। আমি আমার ভাই-এর সাথে কথা বললাম। কারণ আমার একার পক্ষে সবকিছু করা সম্ভব ছিলো না। সে রাজি হলো, আর আমার পরিবারও,' অঞ্জলী বলে।

ভাই-এর সাহায্য পেয়ে আমার সুবিধা হয়েছে, অঞ্জলী বলে। তারা দোকানে পালা করে বসে, তার কারণে সে তার কলেজের শিক্ষা শেষ করতে পেরেছে। দোকানের তাকে থরে থরে আকর্ষণীয় জিনিসের সম্ভার দেখেই বোঝা যায় দোকানটি ভালো ব্যবসা করছে। দোকানটি সব সময় ক্রেতায় ভরে থাকে।

স্কুলের অনেকে মেয়েই এখন অঞ্জলীকে দেখে কন্যাশ্রীর অনুদানের টাকা দিয়ে ১৮ বছর বয়স হলে নিজের নিজের ব্যবসা শুরু করতে চায়। একাদশ শ্রেণীর পলি দাসের মাথায় একটা ব্যবসার পরিকল্পনাও আছে। সে বলে, 'আমি একটা গরু কিনবো, যার দাম পড়বে ৯,০০০ টাকার মতো। আমি তার দেখাশোনা ও যত্ন করবো একবছর ধরে এবং সে যখন গর্ভধারণ করবে তখন ১৫,০০০ টাকা দিয়ে তাকে বিক্রি করে দেবো, যে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তার পরিকল্পনা জানায়। তার কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে এলাকার কয়েকজন মেয়ে জানায় তারাও অঞ্জলীর মতো দোকান করবে কন্যাশ্রীর অনুদানের টাকায়।

কন্যাশ্রী - পরিবর্তনের

গল্প

13

কন্যাশ্রী ক্লাব, তেজগঞ্জ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়
বর্ধমান ১ মিউনিসিপাল এলাকা, পূর্ব বর্ধমান

মা ঠাকুমারা সাক্ষর হতে চাইছেন

প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা কার্যক্রমের কারণে বয়স্ক মহিলারা নিজেরাই তাদের ব্যাঙ্কের কাজ করতে পারছেন

ক্লাসের সবচেয়ে বেশি বয়সী দুজন ছাত্রীর বয়স ৮২ বছর এবং সবচেয়ে কম বয়সী ৩০ বছরের কিছু বেশি। এর মাঝে রয়েছেন ৪০, ৫০ ও ৬০ –এর বয়সী মহিলারা। দলে মা ও ঠাকুমারা রয়েছেন। শনিবার করে তারা লাল রঙের বাজার করার ব্যাগ হাতে ধীরে ধীরে স্কুলে আসেন পড়া, লেখা ও সামান্য অঙ্ক শিখতে। প্রতিটি বাজারের ব্যাগে থাকে একটি বর্ণমালার বই এবং সাধারণ গণিত বই, দুটো খাতা, একটি পেনসিল, একটি ইরেজার ও একটি পেনসিল কাটার কল। এটি একটি উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল যেখানে তাদের বাচ্চারা/ নাতি নাতনীরা পড়ে। ছোটোরা এখন বয়স্ক মহিলাদের শিক্ষকের ভূমিকায় এসে তাদের অশিক্ষার অন্ধকার থেকে মুক্ত করছে।

এই সাপ্তাহিক স্কুলের নাম ‘আলোর দিশা’, যা প্রতি শনিবার বেলা ২ টো থেকে ৩ টে পর্যন্ত একতলার ক্লাসরুমে হয়। ২০১৭ সালে কন্যাশ্রী ক্লাব এই কার্যক্রম শুরু করে ২৭ জন ছাত্রী নিয়ে, যারা তিনবছর পরেও এখনো আছেন।

ছোটোরা এখন বয়স্ক মহিলাদের শিক্ষকের ভূমিকায় এসে তাদের অশিক্ষার অন্ধকার থেকে মুক্ত করছে।

একাদশ শ্রেনীতে পাঠরতা ক্লাবের বর্তমান নেত্রী তনু দাস, এবং ক্লাবের সদস্য সোহিনী দাস, পালা করে এই ক্লাস নেয়। ক্লাবের অন্য সদস্যরা ছাত্রীদের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে যাতে প্রত্যেককে মনোযোগ দেওয়া যায়। প্রত্যেক বয়স্ক শিক্ষার্থীর সাথে একজন করে কন্যাশ্রী থাকে তাদের সাহায্য করার জন্য। ২০১৭ তে মেয়েদের একেবারে গোড়ার থেকে শুরু করতে হয়েছিলো। শিক্ষার্থীদের শেখাতে হয়েছিলো কীভাবে পেনসিল ধরতে হয়।

এখন, এদের মধ্যে কেউ কেউ গড়গড় করে পড়ে যেতে পারে। ৬০ বছরের মালতি পাল যোগ, বিয়োগ করতে পারেন আর খুব ভালো পড়তে পারেন। তিনি যখন প্রথম আলোর দিশায় এসেছিলেন, তিনি নিজের নামও সই করতে পারতেন না।

কন্যাশ্রী মেয়েরা বয়স্ক মহিলাদের লিখতে ও পড়তে শেখাচ্ছে।

কন্যাশ্রী ক্লাবের নেত্রী তনু দাস ক্লাসে পড়াচ্ছে।

৬২ বছরের আরতি সাহা ক্লাসে তার নাতনি কন্যাশ্রী ক্লাবের সদস্য তৃষা সাহার সাথে বসেন; ঠাকুমা যখন খাতায় লেখেন তখন সে দেখে, মাঝে মাঝে সাহায্য করে। আরতি বলেন, 'আমার বই-খাতার থলেটা দেওয়ালে টাঙানো থাকে। সন্ধে বেলা নাতনি যখন পড়তে বসে আমিও আমার খাতা পেন্সিল বার করে ওর সঙ্গে বসে একটু ঝালিয়ে নেই।'

আরতি এরপর আরো বলেন যে পড়তে লিখতে শিখে তিনি আত্মনির্ভর হয়েছেন। আগে তাকে ব্যাঙ্কের টাকা তোলার ফর্ম পূরণ করতে তাকে বউমা ও নাতি নাতনিদের সাধাসাধি করতে হতো। একবার ব্যাঙ্কে তাকে টাকা তোলার জন্য টিপসই দিতে হয়েছিলো। এখন আরতি ফর্ম নিজেই পূরণ করেন, নিজে সই করেন এবং নিজে টাকা তোলেন।

এটা শুধু আরতির গল্প নয়। এটা ক্লাসে সব ৬০ বছরের বেশি মহিলার গল্প, যাদের ব্যাঙ্কে যেতে হয় বয়স্কবেলার পেনশন তোলার জন্য। এছাড়া এমন কিছু মহিলা আছেন, যাদের স্বামীরা অন্য রাজ্যে থাকেন আর বৈদ্যুতিন মাধ্যমে টাকা পাঠান, তাদেরও গল্প এটা।

এইসব বয়স্ক মহিলাদের ব্যাঙ্কে গিয়ে প্রতিবার যে অসুবিধা হতো, তার কথা মাথায় রেখেই আলোর দিশা গড়ে উঠেছিলো। বয়স্কদের শিক্ষা কার্যক্রমের প্রথমদিককার কথা মাথায় রেখে, তনু বলে,'যখনই আমরা ব্যাঙ্কে যেতাম, বয়স্ক মহিলাদের অসুবিধাগুলি নিজেদের চোখে দেখতে পেতাম। ব্যাঙ্কেই একে তাকে ধরার চেষ্টা করতে দেখতাম ওনাদের। অনেকে আবার একটু সাহায্য করেই বিরক্ত বোধ করতেন,' বয়স্ক মহিলাদের এই অসুবিধা দেখে, মেয়েরা নিজেদের মধ্যে কথা বলে তাদের কীভাবে ব্যাঙ্কের ফর্ম পূরণ করতে হবে তা শেখাবে স্থির করে। তারা তাদের কন্যাশ্রী নোডাল শিক্ষককে তাদের আইডিয়ার কথা জানায়। স্কুল তাদের ভাবনার সম্প্রসারণ ঘটিয়ে ফান্ড তৈরী করে বয়স্ক ছাত্রীদের বই ও অন্যান্য পড়াশোনার সামগ্রী দেবার জন্য। এভাবেই আলোর দিশা গড়ে ওঠে। এটাই ছিলো অনেক মহিলার জীবনে নতুন পথ চলার শুরু।

৭৫ বছরের শঙ্করী পাল, এবং ৩০ বছরের তারা পাল শাশুড়ি ও বৌমা; দুজনেই শিক্ষার্থী। শঙ্করী ২০১৭ থেকে পড়াশোনা করছেন, আর তার সব্জি বিক্রেতা ছেলের বউ তারা হিসেব কষা ভালোভাবে শেখার তাগিদে আলোর দিশায় যোগ দেন। আগে ভ্যানে করে দূরে সব্জি বিক্রি করতে যেতে ভয় পেতো এই ভেবে যে ফেরার রাস্তা চিনতে পারবে না। এসব এখন অতীত কারণ এখন যে সে শুধু রাস্তার সাইনবোর্ড গুলো পড়তে পারে তাই নয়, সে কাউকে রাস্তা জিজ্ঞেস করতেও ভয় পায় না। 'এখন ভয় কেটে গেছে,' একগাল হেসে তারা বলে।

তারা সকলে এখন অল্প স্বল্প লিখতে পড়তে শিখে গেছেন তাই তাদের দাবী তাদের একটা করে স্কুল ব্যাগ দিতে হবে যাতে কন্যাশ্রীর এম্বলেম লাগানো থাকবে।

14

কন্যাশ্রী ক্লাব, বড়বেলুন
দেবীবালা বালিকা বিদ্যালয়
ভাতার, পূর্ব বর্ধমান

একটি নাটক যা মা বাবার মধ্যে বাল্যবিবাহের ভয় ধরিয়ে দিয়েছে

জনগোষ্ঠীকে বিপদ সম্পর্কে সচেতন করতে মেয়েরা নাটকে অভিনয় করে

স্কুলের কন্যাশ্রী ক্লাব এতটাই সক্রিয় যে নবম শ্রেণীর ওপরে যারাই পড়ে তারাই এই ব্যানারের নীচে কিছু না কিছু করতে চায়। বনসৃজন করতে মেয়েরা গাছ লাগায় ও সেগুলির যত্ন নেয়; তারা কাছের গ্রামে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ম্যালেরিয়া ও ডেঙ্গুর প্রসার নিয়ে সচেতনতা ছড়ায়।

ক্লাব সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কাজটি করে তা হলো বাল্যবিবাহের খারাপ দিক নিয়ে একটি নাটকে অভিনয় করে। এই গল্পে একটি মেয়ের কথা বলা হয়, যায় অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে যায় আর ১৮ বছর বয়স হবার আগেই সন্তানের জন্ম দেয় সে। কয়েক বছরের মধ্যেই তার স্বামী তাকে ছেড়ে অন্য একজন মহিলার কাছে চলে যায় আর তার শ্বশুরবাড়ির লোকজন তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। মেয়েটি আর তার দুই সন্তানের যাবার কোনো জায়গা ছিলো না। সে তার মা বাবার বাড়িতে এসে ওঠে, কিন্তু এখানেও সে অযাচিত ছিলো। তার ভাই-এর বিয়ে হয়ে গেছিলো আর তার পরিবার ছিলো। মেয়েটি অশিক্ষিত এবং বেকার ছিলো বলে, সে বিনা মাইনের কাজের লোক হয়ে যায়। তাকে তার ভাইয়ের

পরিবারের জন্য কাচা, ধোয়া, পরিষ্কারের কাজ করতে হয় যাতে তার আর তার বাচ্চাদের মাথার ওপরে ছাদ থাকে।

নাটকটি এরপর বন্ধ করে জিজ্ঞাসা করা হয় মেয়েটি যদি স্কুলের পড়া বন্ধ না করতো তবে কী হতো। দর্শকদের বলা হয় একজন অবিবাহিতা পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া ১৩ – ১৮ বছরের মেয়ে কন্যাশ্রী থেকে বছরে কিছু টাকা পায় আর ১৮ বছর বয়স হলে এককালীন অনুদান ২৫,০০০ টাকা পায়। এই টাকা দিয়ে সে আরো পড়তে পারতো, কোনো বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ নিতে পারতো এবং নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারতো। এই নাটকে আরো কিছু সম্ভাবনার কথা বলা হয় – দেখানো হয় একটি মেয়ে পড়াশোনায় ও খেলাধূলায় ভালো ফল করে পুরস্কার পাচ্ছে ইত্যাদি। সংক্ষেপে এই খেলায় দেখানো হয় একটি মেয়ে যদি বিয়ে করে আর বাচ্চার জন্ম না দিয়ে স্কুলে পড়া চালিয়ে যেতো তাহলে তার জীবনটা আরো ভালো হতো।

ক্লাব সেসব গ্রামে এই নাটকের অভিনয় করে দেখায় যেখানে বাল্যবিবাহের প্রকোপ বেশি। তারা চার বছর ধরে এটা করছে কোনো আঙ্গিনা বা রাস্তার কোনে। তারা স্কুলের ইউনিফর্মে অভিনয় করে কোনো কস্টিউম পরে নয়। অল্পবয়সে বিয়ে হওয়া মেয়েটির করুণ গল্প দর্শকদের মনে বিশেষ প্রভাব ফেলে।

এটা রিনা খাতুনের দিদির গল্পও বটে। রিনার দিদির গ্রামের অন্য মেয়েদের মতোই বাচ্চা বয়সে বিয়ে হয়েছিলো; সে খুব কম বয়সে মা হয়েছিলো, তারপর তার স্বামী ও স্বামীর পরিবার তাকে ত্যাগ করে। দিদির এই পরিণতি দেখে রিনা সিদ্ধান্ত নেয় সে কখনোই অল্পবয়সে বিয়ে করবে না বা তার সাথে এই ঘটনা ঘটতে দেবে না।

‘আমি পারলে কখনোই কোনো মেয়ের বাল্য বয়েসে বিয়ে হতে দেব না’

রিনা খাতুন স্কুলের পুরোনো ছাত্রী। কিন্তু তার পুরোনো শিক্ষকরা তাকে এখনো ভীষণভাবে মনে রেখেছে। সে ছিলো

‘আমি পারলে কখনোই কোনো মেয়ের বাল্য বয়েসে বিয়ে হতে দেব না’

– রিনা খাতুন

আমি অঙ্গীকার করি

নাটকে তৈরী করা ক্লাসঘরের দৃশ্য

কন্যাশ্রী মেয়েরা তাদের
শিক্ষিকাদের সাথে
(নীচে ও ওপরে)

কন্যাশ্রী ক্লাবের একজন সক্রিয় সদস্য এবং তার এলাকায় এই নাটকের অভিনয় ঘন ঘন করাতে সে খুবই আগ্রহী ছিলো।

'সে তার বক্তব্য সরাসরি ভালোভাবে প্রকাশ করতে চাইতো,' তার আগের প্রিন্সিপাল বলেন।

নাটকের মেয়েটির সাথে যা যা ঘটেছিলো তা ঘটেছিলো রিনা খাতুনের দিদির সাথেও। তার যখন ১৫ বছর বয়স তার বিয়ে হয়, সে কিছুদিন পরেই একটি বাচ্চা নিয়ে মা বাবার কাছে ফিরে আসে। শ্বশুরবাড়ির লোকজন তাকে তাড়িয়ে দেয়। দিদির অবস্থা দেখে রিনা ঠিক করে সে এমনটা আর হতে দেবে না। বাল্যবিবাহ রুখতে নিজের ক্ষমতায় যা যা করার করবে। শিক্ষকদের সাহায্য নিয়ে রিনা তার এলাকায় তিনটি বাল্যবিবাহ আটকাতে পেরেছে।

রিনা তার এক প্রতিবেশির বিয়ে আটকেছিলো। ঘটনাটা এরকম, তার এক তুতো ভাই পাড়ায় তাদের বাড়ির পেছনে মুরগীর খামার চালাতো। সে একদিন এসে বললো একটি মেয়ের পরিবার তার থেকে সকালে তিনটি মুরগী কিনেছে। রিনার গোয়েন্দা নাক কিছু একটার গন্ধ পেলো। সে কিছু একটা গন্ডগোলের আঁচ করলো; তিনটি মুরগী মানে অতিথিরা বিশেষ কেউ। সামান্য জিজ্ঞাসাবাদ করে সে জানতে পারলো প্রতিবেশিদের বাড়িতে পাত্রপক্ষ মেয়ে দেখতে আসবে, তাই এতো আয়োজন।

পরেরদিন রিনা বিষয়টা নোডাল শিক্ষককে জানালো, যিনি ব্লকের কর্মীদের নিয়ে বিয়েটি আটকালেন। রিনা খাতুন তার পুরোনো স্কুলের এক কিংবদন্তী। বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে লড়াইতে সকলে তার লড়াকু মনোভাবের কথা স্মরণ করে। তার পুরোনো শিক্ষকরা সুযোগ পেলেই তার কথা বলেন।

15

লীনা মুখার্জি, ১৭, একাদশ শ্রেণী
অমারুণ স্টেশন শিক্ষানকেতন,
ভাতার, পূর্ব বর্ধমান

সে তার কন্যাশ্রী ক্লাবকে নিয়ে তিনটি বাল্যবিবাহ আটকেছে

ব্লক অফিসে একবার গিয়ে সে তার সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে বুঝতে পারে

ভাতার ব্লকের বি ডি ও-র সাথে পরিচয়পর্বের মিটিং এ স্কুলের প্রতিনিধি হয়ে যাবার পর লীনা মুখার্জি প্রথম কন্যাশ্রী কন্যা হিসেবে এগিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে পোষণ করে। এই সাক্ষাৎকারের পর থেকে সে বড়োদের দুনিয়ায় প্রবেশ করলো। ‘সেটা ছিলো ২০১৮ সাল’, রিনা বলে; সে তখন ১৬ বছরের ছিলো আর দশম শ্রেণীতে পড়তো। সে সদ্য তার স্কুলে কন্যাশ্রী দলের নেত্রী নির্বাচিত হয়েছে। ‘রিনার অদম্য ইচ্ছাশক্তির জন্য তাকে আমরা নেত্রী নির্বাচিত করি।‘ স্কুলের প্রিন্সিপাল বলেন।

স্কুলের কন্যাশ্রী নোডাল শিক্ষক বি ডি ও অফিসে পরিচিতি পর্বের উক্ত মিটিং-এর আয়োজন করেন। তিনি লীনা ও অন্যান্য কন্যাশ্রী ক্লাব সদস্যকে মিটিং-এ নিয়ে যান। সেখানে লীনা অন্য স্কুলের শিক্ষকদের কাছে তাদের স্কুলের মেয়েদের কৃতিত্বের কথা শুনতে পেলো – কীভাবে তারা ১৮ বছরের কম বয়সের মেয়েদের বিয়ে আটকেছে। ‘ওঁদের কথা শুনে আমি বুঝতে পারলাম কন্যাশ্রী হিসেবে আমরা কতকিছু করতে পারি। বিডিও সাহেবের সঙ্গে মিটিংটা

‘ওঁদের কথা শুনে আমি বুঝতে পারলাম কন্যাশ্রী হিসেবে আমরা কতকিছু করতে পারি। বিডিও সাহেবের সঙ্গে মিটিংটা চোখে আঙ্গুল দিয়ে আমাদের সামাজিক দায়িত্বর সম্বন্ধে আমাকে সচেতন করে তুলেছিল,’

–লীনা

তিনটি বাল্যবিবাহ বন্ধ করার জন্য লীনা ৫,০০০ টাকার একটি চেক পেয়েছে।

চোখে আঙ্গুল দিয়ে আমাদের সামাজিক দায়িত্বর সম্বন্ধে আমাকে সচেতন করে তুলেছিল,’ লীনা বলে।

ব্লক অফিসের সাথে কন্যাশ্রী ক্লাবের মিটিং করিয়েছিলো স্থানীয় প্রশাসন যাতে এদের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ গড়ে ওঠে। লক্ষ্য ছিলো ক্লাবকে বোঝানো যে বাল্যবিবাহ রোধ করার বিষয়ে প্রশাসন কতটা সচেতন। ব্লক অফিস এই মিটিং-কে উৎসাহ দিয়েছিলো কারণ এতে স্কুলে কন্যাশ্রীদের কাজ সম্পর্কে তারা জানতে পারবেন। এই মিটিং কন্যাশ্রীদের বাল্যবিবাহ রোখার জন্য অনেক শক্তি দিয়েছিলো কারণ বন্ধুদের কাছে কোনো বাল্যবিবাহের ঘটনা জানতে পারলে এটা যাদের যাদের ফোন করতে হবে, তাদের সবার ফোন নম্বর তারা পেয়ে গেছিলো। এটা তাদের সরকারি স্তরে সাড়া জাগাবার সাহস দিয়েছিলো।

‘প্রথমে আমি বুঝতে পারিনি কন্যাশ্রী ক্লাবের নেত্রী হয়ে কী করতে হবে। কিন্তু সেদিন বি ডি ও-র কথা শুনে বুঝতে পারলাম, ওঁর অফিসের সাহায্যে, কম বয়সে মেয়েদের বিয়ে রুখতে আমি অনেক কিছু করতে পারি,’ লীনা বলে। ব্লক অফিসে সে কন্যাশ্রী নোডাল ব্যক্তিদের ফোন নম্বর নিয়ে নেয় এবং বিপদে পড়া বাচ্চাদের রক্ষার জন্য গঠিত চাইল্ডলাইন নামে জাতীয় স্তরের হেল্পলাইনের নম্বর নেয়।

দু-বছরের কম সময়ে লীনা ও তার কন্যাশ্রী ক্লাবের সদস্যরা তিনটি বাল্যবিবাহ রুখে দিয়েছে। প্রথমটি হলো স্কুল থেকে দুই কিলোমিটার দূরে অমারুণ গ্রামে। রীনার সেই মুহূর্তটা মনে আছে যখন সে এবং তার সঙ্গী কন্যাশ্রীরা ভূগোল ক্লাস করে বেরোচ্ছিলো, তাদের স্কুলের দারোয়ান জানালেন ক্লাস এইটের

মা ও ঠাকুমার সাথে লীনা।

লীনা ও তার কন্যাশ্রী দল

একটি মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে তার পরিবার। লীনা সঙ্গে সঙ্গে কন্যাশ্রী নোডাল শিক্ষকের কাছে গেলো আর তাঁর সাহায্য নিয়ে ব্লক অফিসে কন্যাশ্রী নোডাল অফিসারকে ফোন করলো। ব্লক দল দুজন পুলিশকে নিয়ে স্কুলে পৌঁছলেন; লীনা আর তার নোডাল শিক্ষক গাড়িতে উঠে সেই মেয়েটির বাড়িতে গেলো, যার পরেরদিন বিয়ে হবার কথা।

পরিবারটি বিয়ের জন্য একেবারে তৈরী ছিলো ; এমনকী মিষ্টিও কেনা হয়ে গেছিলো। ব্লক অফিসার ও পুলিশ মেয়েটির মা বাবাকে বোঝালেন এই বিয়ে আইনসম্মত নয় কারণ মেয়ের বয়স মাত্র ১৫ বছর; পাত্রেরও বিয়ের বয়স হয়নি। মেয়েটির মা বাবা বলেন তারা কোনো ঝুঁকি নিতে চান না। তাদের ভয় তারা যদি মেয়ের এখন বিয়ে না দেন তবে সে কোনো খারাপ ছেলের সাথে পালিয়ে যাবে আর পরিবারের বদনাম হবে।

এরপরে লীনা ও তার কন্যাশ্রী সঙ্গীরা ওই একই গ্রামের আর একটি বিয়ে আটকে দেয় এর ঠিক দু'দিন পরে। যে মেয়েটির বিয়ে হতে চলেছিলো সে টিফিন এর সময় কান্নায় ভেঙে পড়ে এবং সাহায্য চায়। লীনা ও তার কন্যাশ্রী বন্ধুরা ব্লক অফিসের সাহায্য নেয় এবং তাদের উদ্যোগে মেয়েটির মা বাবা বিয়ে পিছিয়ে দেন।

তৃতীয় যে বাল্যবিবাহ লীনা রুখে দিতে পেরেছিলো তা ঘটেছিলো তার নিজেরই গ্রামে। মেয়েটির সঙ্গে পাড়াতে দেখা হওয়াতে সে আবেগ ভরা স্বরে বলে, 'আমি পড়তে চাই। বিয়ে করতে চাই না। তুই একটা কিছু কর, লীনা। আমাকে বাঁচা।' লীনা তারপর যথাযোগ্য পদক্ষেপ নিলো ও বিয়েটা বন্ধ করলো। এভাবে বহু বাল্যবিবাহ বন্ধ করে লীনা তাদের এলাকায় সচেতনতা গড়ে তুলতে পেরেছে।